বিজ্ঞানের নানাকথা

* উৎসর্গ *

পরম পূজনীয়

পরমারাধ্য

মদীয় গুরুদেব

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ

মহারাজের

শ্রীশ্রীপাদপদ্মে—

নিবেদন

বর্ত্তমান যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাই আমাব মনে হয় যাহাতে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চিত্ত ছোট বেলা হইতেই বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যেই প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে আমি "বিজ্ঞান-কাহিনী" নামক পুস্তক প্রথম লিখিয়াছিলাম, এবং একই উদ্দেশ্যে এবার "বিজ্ঞানের নানাকথা" ও "বিজ্ঞানের খবর" নামক দুইখানি পুস্তক বাহির করিলাম।

"বিজ্ঞান কাহিনী"তে আর্কিমিডিস্, গেলিলিও, এডিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনীষিগণের জীবনকাহিনীর ভিতর দিয়া তাঁহাদের আবিষ্কারাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মোটামুটিভাবে দিতে চেষ্টা করিয়াছি, এবং বর্ত্তমান পুস্তক দুইখানিতে দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যহ আমরা যে সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, এবং যেগুলির কারণ জানিতে প্রায় সব ছেলেমেয়ের মনে কৌতূহলের উদয় হয় সেই সকল বিষয় সহজ ভাষায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

যাহাদের জন্য লেখা, পুস্তক কয়খানি তাহাদের আদর পাইলে এবং তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই চারিজনের মনে প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার কৌতূহল জাগিয়া উঠিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকের সমুদয় লভ্যাংশ দেবকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

বিজ্ঞানের নানাকথা

লোহার জাহাজ জলে ভাসে কেন?

তোমরা বোধ হয় অনেক সময় ভাবিয়া ঠিক করিতেই পার নাই যে, একটুখানি লোহার টুক্‌রা জলে ডুবিয়া যায়, অথচ অত ভারী লোহার ষ্টীমার বা জাহাজ তাহাদের গর্ভে হাজার হাজার মণ মাল লইয়া কেমন করিয়া অনায়াসে জলে ভাসিয়া থাকে! বহুদিন পূর্ব্বে যখন জাহাজ তৈরী করিবার প্রথম কল্পনা হইয়াছিল, তখন অনেকেই সে কল্পনাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল—"এক ছটাক লোহা জলে ভাসান যায় না, আর তোমরা হাজার হাজার মণ ভারী জাহাজ জলে ভাসাইবে? যতই চেষ্টা কর না কেন, শেষপর্য্যন্ত উহা সমুদ্রগর্ভে বাস করিবে।" কিন্তু অবশেষে কেন উহা সম্ভব হইল, কেন এত ভারী হইয়াও জাহাজ সত্যসত্যই জলে ভাসিল—সেই কথাই তোমাদের বলিব।

একটি কাচের গেলাসে খানিকটা জল লও, এবং জলের উপরিভাগ গেলাসের যেখানে আছে—ঠিক সেখানে—একটি চিহ্ন দাও। এখন গেলাসের ভিতর সহজেই যাইতে পারে এরূপ ছোট একটি পাথরের টুক্‌রা সূতা দিয়া ঝুলাইয়া ধীরে ধীরে গেলাসের মধ্যে নামাইয়া দাও। দেখিবে যে পাথরের টুক্‌রাটি যেমন জলের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জলও গেলাসের চিহ্ন ছাড়াইয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। যখন পাথরের টুক্‌রাটি জলের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়া যাইবে, তখন জল আর উপরে উঠিবে না। পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, গেলাসের উপর তুমি যেখানে চিহ্ন দিয়াছিলে—তাহার উচ্চে যতটা জল উঠিয়াছে—সেই পরিমাণ জলের আয়তন ঐ পাথরের টুক্‌রাটির আয়তনের ঠিক সমান;—অর্থাৎ **নিমজ্জিত বস্তুর আয়তন, উহার দ্বারা স্থানচ্যুত জলের আয়তনের সমান।** কিরূপে সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস্‌ এই সত্য প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন—তাহা বড়ই কৌতূহলপ্রদ।*

এবার ঐ পাথরের টুক্‌রাটির পরিবর্ত্তে গেলাসের মধ্যে একটি ছোট কাষ্ঠখণ্ড রাখিয়া দেখ যে, উহা জলে ভাসিতে থাকিবে। লক্ষ্য করিয়া দেখ যে, ঐ কাষ্ঠখণ্ডের কিয়দংশ জলের ভিতর ও কিয়দংশ জলের উপরে আছে। যে অংশ

* লেখক প্রণীত "বিজ্ঞান-কাহিনী"তে উহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

জলের মধ্যে আছে জলের ভিতর সেই অংশের জায়গা দিবার জন্য জলের উপরিতল গেলাসের চিহ্নের উপরের দিকে কিছু ঠেলিয়া উঠিয়াছে। এখানেও কাষ্ঠখণ্ডের যতটা অংশ জলমধ্যে নিমজ্জিত আছে, তাহার আয়তন ঐ নিমজ্জিত অংশের দ্বারা স্থানচ্যুত জলের আয়তনের সমান। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ঠিক যতটা জল স্থানচ্যুত হইয়াছে, তাহার ওজন সমস্ত কাষ্ঠখণ্ডটির ওজনের সমান, এবং এইজন্যই উহা ভাসিতে সমর্থ হইয়াছে। এখন কাষ্ঠখণ্ডটির উপর যদি ছোট এক টুক্‌রা লোহা, পাথর বা অন্য কোন ভারী জিনিষ রাখ, তবে দেখিবে যে, কাষ্ঠখণ্ডটির আরও কিছু অংশ জলের মধ্যে প্রবেশ করিবে ; কারণ তখন কাষ্ঠখণ্ড ও লোহা উভয়ের মোট ওজন পূর্ব্বের স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা অধিক হইবে বলিয়া কাষ্ঠখণ্ডটির আরও খানিক অংশ জলমধ্যে প্রবেশ করিবে, এবং তখন স্থানচ্যুত জলের পরিমাণও অধিক হইবে। এইরূপে যখন ঐ স্থানচ্যুত জলের ওজন কাষ্ঠখণ্ড ও লোহার মোট ওজনের সমান হইবে, তখন কাষ্ঠখণ্ডটি আর জলমধ্যে ডুবিবে না ;—অর্থাৎ ঐ পর্য্যন্ত ডুবিয়া ভাসিতে সমর্থ হইবে।

এইবার যদি আর এক টুক্‌রা লোহা কাষ্ঠখণ্ডটির উপরে রাখ, তবে উহার আরও কিছু অংশ জলমধ্যে প্রবেশ করিবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, কাষ্ঠখণ্ডটির উপরিতল পর্য্যন্ত জলমধ্যে গেলেও তদ্দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন কাষ্ঠখণ্ড

ও লোহার মোট ওজন অপেক্ষা কম হয়, তখন কাষ্ঠখণ্ডটি আর ভাসিতে পারিবে না, জলমধ্যে ডুবিয়া যাইবে।

এতক্ষণে বুঝিতে পারিলে যে, কতক জিনিষ জলে ভাসে আবার কতক বা ডুবিয়া যায় কেন? কোন জিনিষের ওজন তদ্দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা অধিক হইলে উহা জলে ডুবিয়া যাইবে (যেমন পাথরের টুক্‌রা গেলাসের জলের মধ্যে ডুবিয়া গেল); এবং কম হইলে উহার কিয়দংশ জলমধ্যে ডুবাইয়া উহা ভাসিতে থাকিবে (যেমন কাষ্ঠখণ্ডটি গেলাসের জলের উপর ভাসিতেছিল)। যদি কোন জিনিষের ওজন সেই সম্পূর্ণ জিনিষটির দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজনের ঠিক সমান হয়, তখন উহা ভাসিবে কিন্তু উহার উপরিভাগ জলের পৃষ্ঠদেশের সহিত এক সমতল থাকিবে; অর্থাৎ জিনিষটি তখন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া ভাসিতে থাকিবে।

পূর্ব্বপরীক্ষায়—কাষ্ঠখণ্ডটির যতটা অংশ জলমধ্যে ডুবিয়া আছে, সেই অংশের দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন কাষ্ঠখণ্ডটির ওজনের সমান; সেইজন্য কাষ্ঠখণ্ডটি ঐ পর্য্যন্ত জলমধ্যে দেহ ডুবাইয়া ভাসিতেছে। যদি উপর হইতে চাপ দিয়া কাষ্ঠখণ্ডটির আরও কিছু অংশ জলমধ্যে ডুবাইয়া দাও তবে তদ্দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন কাষ্ঠখণ্ডটির ওজন অপেক্ষা অধিক হইবে; সেজন্য জল কাষ্ঠখণ্ডকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিবে, এবং উপরের চাপ ছাড়িয়া দিলে তখনই

কাষ্ঠখণ্ডটি পূর্ব্বের ন্যায় জলের উপর ভাসিয়া থাকিবে। বেশী ডুবাইয়া দিলে জলের ভাসাইয়া তুলিবার ক্ষমতা তোমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছ। একটি কাঠের পেন্‌সিল বা লম্বা কাঠের টুক্‌রাকে সোজা জলমধ্যে ডুবাইয়া ছাড়িয়া দিলে দেখিবে যে, তৎক্ষণাৎ উহা উপরে ভাসিয়া উঠিবে। পুকুরে স্নান করিবার সময় দেখিবে যে, জলে ডুব দিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলেই জল তোমাকে ঠেলিয়া উপরে ভাসাইয়া তুলিবে। জলের ভাসাইয়া তুলিবার ক্ষমতার জন্যই জলে নিমজ্জিত বস্তু অনেক হাল্‌কা বোধ হয়। একখানি ইট্‌ হাতে করিয়া দেখ যে কত ভারী, কিন্তু উহাকে ঐ অবস্থায় জলে ডুবাইলে কত হাল্‌কা মনে হইবে।
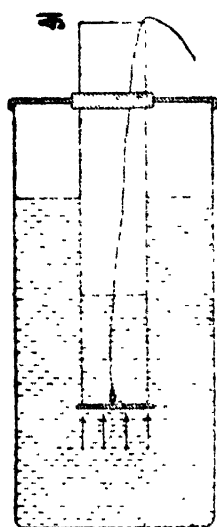
চাক্‌তির নীচের জল উহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে।

জল যে উপরের দিকে ঠেলে বা চাপ দেয় তাহা একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা বেশ প্রমাণ করা যায়। একটি কাচের মোটা নল (ক) লও আর উহার নীচের মুখে ঠিক ফিট করে—অন্ততঃ ছোট না হয়—এরূপ একখানি টিনের চাক্‌তি লও (চিত্র দেখ)। চাক্‌তির একদিকে একটি ছোট আংটা হইতে খানিকটা সূতা বাঁধা আছে। এইবার চিত্রে

যেরূপ দেখান আছে ঐরূপে সূতাটি ভিতর দিক হইতে টানিয়া রাখিয়া চাক্‌তিটি কাচ নলের একদিকে আট্‌কাইয়া রাখ এবং ঐরূপ অবস্থায় অন্য একটি জলপূর্ণ পাত্রের ভিতর কাচ নলটির খানিকটা ডুবাইয়া ধর। এখন সূতাটি ছাড়িয়া দিয়া দেখ যে টিনের চাক্‌তিটা আর জলের ভিতর চলিয়া যাইতেছে না। কে যেন উহাকে আঠা দিয়া কাচ নলের মুখে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে জলের উপরের দিকে চাপ আছে বলিয়া,—অর্থাৎ চাক্‌তির নীচের জল উহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই—উহা পড়িয়া যাইতেছে না। আরও মজা এই যে এইবার কাচ নলের উপরের মুখ হইতে উহার ভিতরে অল্প জল ঢালিলে তাহার ভারেও চাকৃতি নীচে পড়িবে না। কিন্তু ঐরূপ অল্প অল্প করিয়া জল কাচ নলের ভিতর দিতে থাকিলে শেষে এক সময় চ.কতিটি আর ভার রাখিতে না পারিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে;—অর্থাৎ যখন চাকতির নীচের জলের উপরের দিকে যে চাপ আছে তাহার জোর অপেক্ষা কাচ নলের ভিতরকার জলের চাক্‌তির নীচের দিকে দেওয়া চাপের জোর বেশী হয় তখন চাক্‌তিটা পড়িয়া যায়।

এইবার জলের উপরে জাহাজ কেন ভাসে তাহা বুঝিতে আর কষ্ট হইবে না। হাঁড়ি বা কড়াইয়ের ন্যায় পেটের আকারই জাহাজ ভাসিবার **প্রধান কারণ।**

মাটির বা কোন ধাতুর হাঁড়ি বা কড়াই সহজে জলে ভাসিতে পারে তাহা তোমরা জান ; কিন্তু ঐ হাঁড়ি বা কড়াই ভাঙ্গিয়া উহার টুক্‌রাগুলি জলে দিলে তখনই ডুবিয়া যাইবে। ইহার কারণ হাঁড়ি বা কড়াইয়ের পেটের ঐরূপ আকারের জন্য উহারা সামান্য কিছু দূর জলের ভিতর গিয়া যতটা জল স্থানচ্যুত করিতে পারে তাহার ওজন সব হাঁড়িটা বা কড়াইটার ওজনের সমান হয়। যদি এখন হাঁড়িটার ভিতর কিছু ভারী জিনিষ রাখিয়া দাও তবে দেখিবে যে উহাদের আরও খানিকটা জলের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে ; কারণ ভিতরে অন্য জিনিষ দেওয়াতে হাঁড়িটার ওজন বাড়িয়া গিয়াছে, এবং সেজন্য ঐ জিনিষ রাখিবার পূর্ব্বে স্থানচ্যুত জল যতটা ছিল তাহার ওজন ঐ জিনিষ ও হাঁড়িটার মোট ওজন অপেক্ষা কম হইবে। সুতরাং এখন হাঁড়িটা আরও একটু জলের নীচে চলিয়া যাইবে, যতক্ষণ না উহার দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন জিনিষ ও হাঁড়ির মোট ওজনের সমান হয়। এইরূপে যখন পুনরায় জিনিষ ভরা হাঁড়িটার দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন জিনিষ ও হাঁড়ির মোট ওজনের সমান হইবে তখন আবার হাঁড়িটা ভাসিতে থাকিবে। জাহাজ, নৌকা ইত্যাদি ঐরূপ নতোদর বলিয়াই উহাদের তলদেশের কিয়দংশ দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন জাহাজ বা নৌকার মোট ওজনের সমান হয় এবং সেজন্য উহারা ভাসিতে সমর্থ হয়। এরূপ আকার না করিয়া জাহাজে যত লোহা আছে সব পিটাইয়া

পিণ্ডাকৃতি করিলে উহা যে কিছুতেই ভাসিবে না, তাহা বলা বাহুল্য। হাঁড়ির ভিতর চাউল বা অন্য কিছু বোঝাই করার ন্যায় যদি জাহাজের ভিতর মাল বোঝাই করা হয়, তবে জাহাজের আরও কিছু অংশ জলমধ্যে ডুবিয়া যাইবে, কারণ এক্ষেত্রে স্থানচ্যুত জলের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক। ধর, যদি মালবোঝাই একখানি জাহাজের ওজন লক্ষ মণ হয়, তবে তদ্দারা স্থানচ্যুত জলের ওজনও লক্ষ মণ হইবে। বোঝাই জাহাজ যখন জলের উপর ভাসিয়া আছে এমন সময় যদি কোন প্রকারে উহার চারিদিকের ও নীচের জল হঠাৎ জমিয়া বরফ হইয়া যায়, এবং তখন যদি কোন উপায়ে জাহাজকে ঐ বরফের উপর হইতে তুলিয়া লওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে যে বরফের উপর জাহাজ যেখানে বসিয়াছিল সেই গর্ত্তটি পূর্ণ করিতে ঠিক লক্ষ মণ ওজনের জলের দরকার হইয়াছে।

আজকাল যে ডুবোজাহাজের (Submarine) সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। এগুলি সাধারণতঃ জলের উপরে ভাসিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে জলের মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। এই জাহাজের অগ্রে, পশ্চাতে ও মধ্যে তিন জায়গায় জল ভরিয়া লইবার আধার আছে। জলমধ্যে যাইবার সময় ঐ আধার কয়টি জলে ভরিয়া লওয়া হয়। ঐ আধার কয়টির আয়তন এইরূপ যে, উহাদের জলপূর্ণ করিলে জাহাজ এবং ঐ জলের ওজন,

জাহাজের দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা ঈষৎ ভারী হয়। তখন জাহাজটি আর উপরে ভাসিতে সমর্থ না হইয়া জলের ভিতর প্রবেশ করে; অথচ জলের খুব নীচে যায় না। আবার উপরে উঠিবার আবশ্যক হইলে পাম্প দিয়া ঐ সব আধার হইতে জল বাহির করিয়া দিলেই জাহাজ হাল্‌কা হইয়া ভাসিয়া উঠে। বরফ জলে ভাসে কেন এবার তাহা বলিতে পার কি ?

সাঁতার দিবার কৌশল

জাহাজ কেন জলে ভাসে বুঝিতে পারিলে আমরা কেমন করিয়া জলে সাঁতার দিতে পারি তাহাও বুঝিতে পারিবে।

আমাদের দেহটা জল অপেক্ষা সামান্য ভারী; আবার দেহের মধ্যে মাথাটাই অধিক ভারী। আমাদের দেহকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে হইলে দুই উপায়ে উহা করা যাইতে পারে। প্রথম,—একটি বয়ার উপর দেহকে আট্‌কাইয়া রাখিলে অনায়াসে ভাসিয়া থাকিতে পারা যায়,

যদি বয়া ও দেহের মোট ওজন স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা কম হয়। বয়া কি তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ ত? যাহারা কলিকাতায় থাক, তাহারা গঙ্গার ধারে গেলেই দেখিতে পাইবে যে, যেখানে নৌকা, ষ্টীমার ইত্যাদি থাকে, সেই সব জায়গায় জলের উপরে অনেকগুলি প্রায় গোলাকার কাঠের জিনিষ ভাসিতেছে। উহাদের নাম বয়া। লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে হাওড়ার পোলটিও ঢোলকের মত চেহারার বড় বড় বয়ার উপর ভাসিয়া আছে। ঐ বয়া-গুলির দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন এত বেশী যে, উহা মানুষ গাড়ী ঘোড়া সমেত অতবড় পোলটিকে ভাসাইয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য নদীতে জেলেরা অনেক সময় মাছ ধরিবার জন্য জালের একধার ছোট ছোট বয়ায় বাঁধিয়া জলের উপর ভাসাইয়া রাখে, তাহাও বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে। জাহাজের বা ষ্টীমারের উপরে চারিদিকে মোটর গাড়ীর চাকার মত চেহারার অনেকগুলি মোটা মোটা চাকা ঝুলান থাকে। ঐগুলিকে 'লাইফ্ বয়' (Life buoy) বলে। একজন লোক ঐরূপ একটি 'বয়' পেটের নীচে রাখিয়া জলের উপর অনায়াসে ভাসিয়া থাকিতে পারে, কারণ ঐগুলি শোলা বা ঐ জাতীয় কোন হালকা জিনিষে এরূপ ভাবে তৈরী যে, একজন মানুষ ও একটি বয়ের মোট ওজন—উহাদের দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা কম এবং সেইজন্যই উহার উপরে থাকিয়া সহজেই ভাসিয়া থাকা যায়। জাহাজ বা

ষ্টীমার ডুবিয়া গেলে ঐগুলি যাত্রীদের জীবনরক্ষার সাহায্য করে বলিয়া উহাদিগকে 'লাইফ বয়' বলে।

একটি মাটির বা পিতলের কলসী জলে ভরিয়া জলের উপর রাখিলে তৎক্ষণাৎ উহা ডুবিয়া যাইবে; কারণ কলসীটি ও উহার ভিতরের জলের মোট ওজন উহার দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা অনেক ভারী। কিন্তু ঐ কলসীটিকে জলশূন্য ও উপুড় করিয়া জলের উপর ছাড়িয়া দিলে উহা অনায়াসে ভাসিয়া থাকিবে। যেহেতু এখন উহার ভিতরে জলের পরিবর্ত্তে হাওয়া ভরা আছে সেজন্য উহার ওজন উহার দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন অপেক্ষা এত কম যে, উহা একটি বয়ার মত কাজ করিতে পারে। এই হেতু একজন মানুষ ঐরূপ একটি উপুড়-করা কলসী পেটের নীচে রাখিয়া জলের উপর অতি সহজেই ভাসিয়া থাকিতে পারে। তোমরা হয়ত প্রথম সাঁতার শিখিবার সময় অনেক-কেই ঐরূপ কলসী লইয়া সাঁতার দিতে দেখিয়া থাকিবে।

পুকুরের বা নদীর জলে ভাসিয়া থাকা অপেক্ষা সমুদ্রের জলে ভাসিয়া থাকা অপেক্ষাকৃত সহজ; কারণ সমুদ্রের লোণা জল পুকুরের বা নদীর জল অপেক্ষা একটু ভারী। কাজেই আমাদের দেহের সমান আয়তনের পুকুরের বা নদীর জলের ওজন অপেক্ষা সেই পরিমাণ সমুদ্রের জলের ওজন বেশী, এবং সেই কারণে সমুদ্রের জলের ভাসাইয়া রাখিবার ক্ষমতাও বেশী।

জলে ভাসিয়া থাকিবার প্রথম উপায়ের কথা বলিয়াছি—এইবার দ্বিতীয় উপায়ের কথা বলিব। বয়ার অভাবে আমরা জলের উপর হাত পা নাড়িয়া দেহটাকে ভাসাইয়া রাখিতে পারি ; কিন্তু উহা প্রথম উপায়ের ন্যায় অত সহজ নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের মাথাটা দেহের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা ভারী, আর মাথা জলের মধ্যে গেলেই দমবন্ধ হইয়া যায় ; অতএব হাত পা চালনা দ্বারা মাথাটাকে জলের উপরে ভাসাইয়া রাখিবার কৌশলটি শিখিতে পারিলেই সাঁতার শেখা হইল। হাত ও পায়ের চালনাদ্বারা দু'টি কাজ হয়– দেহকে জলের উপরে ভাসাইয়া রাখা, এবং সেই সঙ্গে অগ্রবর্ত্তী হইবার গতি দান করা। গরু বা অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুদিগের মাথা অপেক্ষা পিছনদিক ভারী বলিয়া তাহারা সহজেই মাথাকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিতে পারে ; তাই মানুষের মত তাহাদের সাঁতার শিখিতে হয় না, তাহারা স্বভাবতঃই সাঁতার দিতে পারে। হাস জাতীয় কতকগুলি পাখী কেবল পা দু'টি ছাড়া দেহের প্রায় সবটাই জলের উপর রাখিয়া ভাসিতে পারে। উহার কারণ এই যে, দেহের নীচের পালক ইত্যাদির আবরণ ভেদ করিয়া জল উহাদের আসল দেহ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে না, এবং সেজন্য উহাদের দেহের অতি সামান্য পরিমাণ অংশ জলে ডুবিলেই তদ্দারা স্থানচ্যুত জলের ওজন উহাদের ওজনের সমান হয়। তোমরা দেখিয়াছ যে, মাছেরা জলের মধ্যে ইচ্ছামত কেমন

উপরে নীচে চলিয়া বেড়ায়। প্রায় সব মাছের মেরুদণ্ডের নীচে একটি বাতাসের থলি আছে। আমরা যেমন ইচ্ছামত দেহের ভিতর বাতাস লইতে বা ভিতর হইতে বাতাস বাহির করিয়া দিতে পারি, মাছেরাও সেইরূপ ইচ্ছামত থলিটার ভিতর কম বেশী বাতাস ভরিয়া লইতে পারে। উপরে উঠিবার সময় বাতাস বেশী ভরিয়া দেহকে হাল্‌কা করিয়া লয়, এবং নীচে নামিবার সময় কিছু বাতাস ছাড়িয়া দেহকে ভারী করিয়া দেয়। আমরাও ভিতরে বাতাস টানিয়া লইয়া জলের ভিতর ডুব দিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলে, জল আমাদিগকে উপরে ভাসাইয়া তোলে; আবার যতদূর সম্ভব দেহ হইতে বাতাস বাহির করিয়া দিয়া ডুব দিলে জলের নীচের দিকে যাওয়া যায়।

সাঁতার জানে না এমন লোক জলে পড়িয়া গেলে সে যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া দেহকে চিৎ করিয়া জলের উপর ভাসিয়া থাকিতে চেষ্টা করে, তবে মুখ উপরের দিকে থাকার জন্য শীঘ্র তাহার দম বন্ধ হয় না, এবং সেজন্য সাহায্যের আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে সকলেই ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়—এবং সাহায্যের আশায় বা কিছু আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য মাথা ও হাত জলের উপর উঠাইবার চেষ্টা করে। ইহাতে বিপদ আরও বাড়িয়া যায়; কারণ উপুড় হইয়া থাকার জন্য যখন দম বন্ধ হইয়া আসে, তখন জল খাইয়া শরীর আরও

ভারী হইয়া যায় ; তাহা ছাড়া দুই হাত জলের উপর উঠাইলে তাহাদের দ্বারা জল স্থানচ্যুত হইতে পারে না, এবং সেজন্য মোট স্থানচ্যুত জলের ওজন আরও কমিয়া যাওয়ায় দেহ জলের ভিতর শীঘ্রই ডুবিয়া যাইতে থাকে। রোগা লোক অপেক্ষা একই ওজনের মোটা লোক সহজেই জলে ভাসিতে পারে ; কারণ তাহার দেহ অধিক জল স্থানচ্যুত করে।

সাঁতারের ব্যাপার শেষ হইল। এইবার বরফ কেন জলে ভাসে তাহা বলিয়া এ কথা শেষ করিব। তোমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছ যে, কোন জিনিষের দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন যদি সেই জিনিষের ওজন অপেক্ষা অধিক হয়, তবে জিনিষটি জলে ভাসিতে পারে। বরফ, জমানজল ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাপি জলকে জমাইলেই উহা কেমন করিয়া হাল্কা হইয়া যায়, সে রহস্যের ভিতর কেবল একটি কথা জানিবার আছে ; তাহা এই যে, জলকে জমাইয়া বরফ করিলে উহার আয়তন বাড়িয়া যায় ; অর্থাৎ বরফ অবস্থায় উহার আয়তন, যে পরিমাণ জল হইতে বরফ হইয়াছে, তাহার আয়তন অপেক্ষা অধিক। সেজন্য কোন বরফখণ্ডকে জলের উপর রাখিলে উহার দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন সকল সময়েই বরফখণ্ডটির ওজন অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে ; কাজেই বরফ জলে ভাসে।

চলন্ত ট্রামথেকে নামা

জগতে সকল পদার্থই যখন যে অবস্থায় থাকে বরাবর সেই একই অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করে, নিজে নিজে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। যাহারা নিশ্চল অবস্থায় আছে তাহারা নিশ্চল থাকিতে চেষ্টা করে, এবং যাহারা গতিশীল তাহারা সেইরূপ গতিশীল অবস্থায় থাকিতে চেষ্টা করে। বাহির হইতে বল প্রয়োগ না করিয়া উহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করা যায় না। পদার্থের সচল বা নিশ্চল যে কোন অবস্থার পরিবর্ত্তনের অক্ষমতাকে উহার জড়ত্ব বা **স্থিতিস্থাপকত্ব** বলা হয়।

একটু লক্ষ্য করিলেই এই বিষয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত তোমরা দেখিতে পাইবে। একটি ভারী লোহার চাকা রাস্তার উপর গড়াইয়া দিতে হইলে—অর্থাৎ তাহাকে নিশ্চল অবস্থা হইতে সচল অবস্থায় আনিতে হইলে—কিছু বল প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু উহা একবার চলিতে আরম্ভ করিলে কেবল চলিতেই থাকিবে। তখন উহাকে থামাইতে হইলে পুনরায় উল্টাদিকে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য রাস্তা খুব মসৃণ না হইলে চাকা কিছুদূর গিয়া আপনিই থামিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা রাস্তার ঘর্ষণ জনিত

বাধার জন্য। রাস্তা যত মসৃণ হইবে ঘর্ষণের জন্য বাধা তত কম হইবে, এবং চাকাও তত অধিক দূর যাইবে।

যখন তোমার বন্ধু রাস্তার উপর জোরে দৌড়াইতেছে তখন তাহাকে যদি জড়াইয়া ধরিয়া থামাইতে যাও তবে তোমাকে বিশেষ বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে তাহার ও তোমার উভয়েরই জড়ত্ব আছে ইহাই বুঝা যাইবে। তাহার জড়ত্বের জন্য সে দৌড়াইতেই থাকিবে, এবং তাহাকে থামাইতে গেলে তোমাকে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। আবার তোমার জড়ত্বের জন্য তুমি যেমন নিশ্চল অবস্থায় আছ সেইরূপ নিশ্চল থাকিতে চেষ্টা করিবে, এবং তোমার বন্ধুর সচল অবস্থার কিছু জড়ত্ব তোমার ধাক্কার দ্বারা নষ্ট হইবে। তোমার কিছুমাত্র জড়ত্ব না থাকিলে তুমি তোমার বন্ধুকে থামাইতে পারিবে না। তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থামাইতে গেলে সে তোমাকেও সঙ্গে লইয়া একই গতিতে চলিয়া যাইবে।

জড়ত্বের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যদি কোন ঘোড়া পৃষ্ঠে আরোহী লইয়া খুব জোরে দৌড়াইতে দৌড়াইতে হঠাৎ থামিয়া যায় তবে আরোহীর কি দশা হইবে বল ত? আরোহী ঘোড়ার মাথার উপর দিয়া ছিট্‌কাইয়া সম্মুখ দিকে পড়িয়া যাইবে। ইহার কারণ এই যে দৌড়াইবার সময় অশ্বের ও আরোহীর একই গতি ছিল। ঘোড়া হঠাৎ নিজের গতি থামাইয়া দিল, কিন্তু জড়ত্বের জন্য

আরোহীর গতি পূর্ব্বের ন্যায় ঘোড়ার সম্মুখ দিকেই থাকিবে। সেজন্য ঘোড়া থামিয়া গেলেও আরোহী যে দিকে যাইতেছিল সেই দিকেই যাইতে চাহিবে; সুতরাং সম্মুখে ছিট্‌কাইয়া পড়িবে। আবার ঘোড়া আরোহীকে পিঠের উপর লইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় যদি হঠাৎ জোরে দৌড়াইতে আরম্ভ করে, তবে একই কারণে আরোহী পিছন দিকে পড়িয়া যাইবে। ঘোড়া যখন স্থির ছিল তখন আরোহীও স্থির ছিল। হঠাৎ ঘোড়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিলে আরোহীর যে অংশ ঘোড়ার পিঠের সহিত লাগিয়া ছিল তাহা ঘোড়ার সহিত সম্মুখ দিকে যাইবে, কিন্তু আরোহীর দেহের উপরের অংশ যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় থাকিতে চাহিবে, ফলে আরোহী পিছন দিকে পড়িয়া যাইবে।

দ্রুতগামী রেলগাড়ী যদি হঠাৎ থামিয়া যায় তবে উহার আরোহীরা বেঞ্চির উপর হইতে সম্মুখ দিকে—অর্থাৎ ইঞ্জিনের দিকে—হুমড়ি খাইয়া পড়িবে। আবার স্থির অবস্থা হইতে গাড়ী যদি হঠাৎ জোরে চলিতে আরম্ভ করে তবে আরোহীরা পিছনদিকে পড়িবে। পূর্ব্ব হইতে গাড়ীর কাঠের দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকিলে মাথাগুলির সহিত ঠকাঠক্ ধাক্কার আওয়াজ শুনা যাইবে। চলন্ত ট্রামগাড়ী হইতে নামিতে গেলে প্রায়ই সকলে কেন পড়িয়া যায় তাহা এইবার একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে। ট্রামের ভিতর যখন কেহ

থাকে তখন ট্রামের ও তাহার গতি একই দিকে থাকে। এখন যদি লোকটি ট্রাম যে দিকে যাইতেছে তাহার উল্টাদিকে মুখ করিয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়ে, তবে তাহার পা দুটি জমি স্পর্শ করিয়া থামিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দেহের উপরের অংশের গতি পূর্ব্বের ন্যায় ট্রামের সম্মুখ দিকেই থাকিবে; সুতরাং সে চিৎ হইয়া পড়িয়া বিষম আছাড় খাইবে। চলন্ত ট্রামগাড়ী হইতে নামিতে হইলে যেদিকে গাড়ী যাইতেছে সেইদিকে মুখ করিয়া ও শরীর ঈষৎ পিছনে হেলাইয়া রাস্তায় লাফাইয়া পড়িয়াই পুনরায় সম্মুখদিকে দুই এক পা দৌড়াইয়া যাইতে হয়, নতুবা পড়িয়া যাইবে; কারণ ট্রামের উপর হইতে রাস্তায় পড়িয়া হঠাৎ পা থামিয়া গেলেও দেহের উপরের অংশের গতি সম্মুখদিকেই থাকিবে, সুতরাং সম্মুখে হুমড়ি খাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা; কিন্তু দেহ পিছন দিকে সামান্য হেলাইয়া রাখিলে ও লাফাইবার পর সম্মুখদিকে সামান্য দুই এক পা দৌড়াইলে ততক্ষণে দেহের উপরের ও নীচের অংশের গতি সমান হইয়া যায়, তাই আর পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না।

একটি কথা বলিয়া রাখি—যদিও চলন্ত ট্রামগাড়ী হইতে নামিবার কৌশল শিখিলে, তথাপি এরূপ চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে জড়ত্ব না থাকিলে এ সমস্ত গোলমাল থাকিত না; কিন্তু তাহাতে যে আরও কত

অসুবিধা হইত তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি। জড়ত্ব না থাকিলে ঢিল ছুড়িয়া বেশীদূর পাঠাইতে পারিতে না, ইহা সেইখানেই নীচে পড়িয়া যাইত। ফুট্‌বলে খুব জোরে কিক্‌ করিলেও উহা দূরে পাঠাইতে পারিতে না। বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত বেশী দূরে যাইত না। আবার সুবিধার মধ্যে রেলগাড়ী বা মোটরগাড়ীকে ব্রেক কষিয়া থামাইবার দরকার হইত না; কারণ রেলগাড়ীতে বাষ্প ও মোটরগাড়ীতে পেট্রোল বন্ধ করিয়া দিলেই তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামিয়া যাইত, এখনকার মত সম্মুখে অগ্রসর হইত না; এবং এখন যেমন দ্রুতগামী গাড়ী হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেলে আরোহীর ধাক্কা লাগে তখন জড়ত্ব না থাকার জন্য সে সব ভয় কিছু থাকিত না।

ঘর্ষণের আবশ্যকতা

কোন এক বস্তু অপর এক বস্তুর উপর দিয়া চলিবার সময় যে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহাকে আমরা **ঘর্ষণ** বলি। পূর্ব্ব প্রবন্ধের চাকা গড়াইবার দৃষ্টান্ত লও। রাস্তার উপর যদি তুমি একটি লোহার বা কাঠের চাকা গড়াইয়া দাও তবে দেখিবে যে কিছুদূর গিয়া চাকাটি থামিয়া যাইবে। কেন

বল ত? রাস্তার উপরিভাগ আব্‌ড়োথাব্‌ড়ো বা অমসৃণ বলিয়া তাহার সহিত ঘর্ষণের ফলে বাধা পাইয়া চাকার বেগ কমিয়া যাইবে। রাস্তা যত কম অমসৃণ হইবে ঘর্ষণের বাধা তত কম হইবে, এবং চাকাও তত অধিক দূর যাইতে সমর্থ হইবে; সেজন্য রাস্তার পরিবর্ত্তে যদি চাকাকে খুব লম্বা ঘরের মেঝের উপর গড়াইয়া দাও তবে উহা আরও বেশী দূর যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি চাকা ও ঘরের মেঝে বা রাস্তার মধ্যে কিছুমাত্র ঘর্ষণজনিত বাধা না থাকে তবে কি হইবে বল ত? তাহা হইলে চাকাটি একই জায়গায় ঘুরিতে থাকিবে, অগ্রসর হইতে পারিবে না; কিন্তু চাকাটি চলিতে আরম্ভ করিবার পর যদি ঘর্ষণজনিত বাধা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় তবে স্থিতিস্থাপকত্ব ধর্ম্মের জন্য উহা চলিতেই থাকিবে —আর থামিবে না। সকল পদার্থের জড়ত্ব বা স্থিতি-স্থাপকত্ব ধর্ম্মের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভাল করিয়া বলিয়াছি।

পৃথিবীতে ঘর্ষণজনিত বাধা একেবারে না থাকিলে কি হইত বল দেখি? হিসাব করিয়া দেখ যে কত গোলমাল হইত;—বাতাসের সহিত ঘর্ষণবন্ধের ফলে পাখীরা উড়িতে পারিত না, এবং রাস্তার সহিত ঘর্ষণ না থাকিলে আমরা কেহই হাটিতে পারিতাম না; হাটিতে গেলেই পড়িয়া যাইতাম। নূতন জুতা পরিয়া চক্‌চকে সিমেণ্ট করা পালিশ জায়গার উপর হাটিতে গিয়া অনেক সময় দেখিয়াছ যে পা কেবলই পিছ্‌লাইয়া যায়। নূতন জুতার তলা ও

পালিশ জায়গার ভিতর ঘর্ষণের বাধা খুব কম থাকে বলিয়া এইরূপ হয়। বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে গেলেও এই দশা হইবে। ঘর্ষণের বাধা না থাকিলে পেরেক্ বা স্ক্রু মারিয়া কাঠ জোড়া যাইবে না, কোন কারখানায় পটি দ্বারা যন্ত্রাদি ঘুরান যাইবে না, এবং সূতা বা দড়িতে গাঁইট দিয়া কোন জিনিষ আট্‌কান যাইবে না, ইত্যাদি। অনেক সময় বৃষ্টির পর ঘর্ষণের বাধা বাড়াইবার জন্য ট্রাম ও রেল লাইনের উপর বালি ছড়াইয়া দেওয়া হয় নতুবা চাকা পিছ্‌লাইয়া যায়; আবার একই কারণে বেহালা বা এস্‌রাজ বাজাইবার সময় উহার ছড়ে রজন ঘষিয়া লওয়া হয়।

ঘর্ষণের আবশ্যকতার এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ঘর্ষণ না থাকিলে কি বিপদ হয় তাহার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত লও।

মনে কর—বেশী দেরী হইয়া গিয়াছে বলিয়া তুমি খুব জোরে হাঁটিয়া স্কুলে যাইতেছ এমন সময় ঘর্ষণ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তখনই রাস্তা এত পিছল হইয়া যাইবে যে তুমি হয় উপুড় নয় চিৎ হইয়া পড়িয়া যাইবে, এবং রাস্তা যদি একদিকে গড়ানে থাকে তবে গড়্ গড়্ করিয়া ভীষণ বেগে নীচের দিকে গড়াইতে থাকিবে। গড়াইবার সময় হয়ত দেখিলে যে রাস্তার উপর একটি দড়ি পড়িয়া আছে এবং দড়ির অপর প্রান্ত একটি গাছে বাঁধা আছে। তুমি হয়ত আর গড়াইতে হইবে না ভাবিয়া দড়িটা

কোনরূপে ধরিয়া ফেলিলে। কিন্তু যতই শক্ত করিয়া চাপিয়া ধর দড়ি হাতের ভিতর দিয়া কেবলই পিছ্‌লাইয়া যাইবে। দড়ির প্রান্তে যদি গাঁইট দিয়া একটি বেড় থাকে, এবং তুমি তাড়াতাড়ি তাহার ভিতর হাত ঢুকাইয়া আঁকড়াইয়া থাকিতে চাও তবে তখনই দড়ির গাঁইট ও এমন কি দড়ির অংশগুলিও খুলিয়া যাইবে, অতএব তোমার পূর্ব্বাবস্থার শেষ হইবে না। তারপর আবার গড়াইতে গড়াইতে হয়ত রাস্তার ধারে একটি কাঠের বেড়া দেখিয়া তাহাই জড়াইয়া ধরিলে, কিন্তু যেসব পেরেক্ দিয়া কাষ্ঠ-খণ্ডগুলি জোড়া ছিল, টানাপড়াতে সেগুলি নিজ নিজ গর্ত্ত হইতে সব বাহির হইয়া আসিল; সুতরাং বেড়া খুলিয়া গেল এবং তুমিও আবার গড়াইতে লাগিলে। সমস্ত দিন এইরূপ অবস্থায় থাকিতে থাকিতে অবশেষে সন্ধ্যা হইল। তখন হয়ত রাস্তা দেখিবার জন্য পকেট হইতে দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিবার চেষ্টা করিলে; কিন্তু প্রথমতঃ এ অবস্থায় পিছল হাত দিয়া দেশালাই পকেট হইতে বাহির করাই সম্ভব হইবে না, এবং তাহা ছাড়া দেশালাইয়ের কাঠি বাক্সের গায়ে যতই ঘর্ষণ কর তাহা জ্বলিবে না।

তুমি হয়ত ভাবিতে পার যে স্কুলে যাইবার সময় হাঁটিয়া না গিয়া মোটরগাড়ীতে গেলে এত বিপদ হইত না; কিন্তু তাহাতেও বিপদ কিছু কম হইত না। যদি মোটরগাড়ী দৌড়াইতেছে এমন সময় ঘর্ষণ বন্ধ হইয়া যায়—তবে গাড়ী

বোঁ বোঁ করিয়া ভীষণ বেগে ছুটিতেই থাকিবে। ব্রেক্ কসিয়া গাড়ী থামাইতে পারিবে না, কিংবা গাড়ী কোন দিকে ঘুরাইতেও পারিবে না, কারণ—চালকের সম্মুখে যে গোল চাকা থাকে তাহা ঘুরাইয়া গাড়ীর চাকা ঘুরাইতে গেলে হাত পিছলাইয়া যাইবে সুতরাং চাকা ঘুরিবে না। এইরূপ চলিতে চলিতে যদি সম্মুখে কোন পাহাড় পড়ে তবে গাড়ী তাহার উপর উঠিতে যাইবে এবং সে সময় অবশ্য বেগ কমিয়া গাড়ী থামিয়া যাইবে; কিন্তু তুমিও এইবার রক্ষা পাইলে ভাবিয়া গাড়ী হইতে বাহির হইতে না হইতেই উহা আবার পিছন দিকে চলিতে থাকিবে; এবং হয়ত শেষে রাস্তার ধারে কোন বাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। সুতরাং ভাবিয়া দেখ ঘর্ষণের বাধা বন্ধ হইলে কত মুস্কিল। ইহার অভাবে স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়া শেষে তুমি কত বিপদে পড়িলে। ঘর্ষণের বাধা না থাকিলে কোন লোক সমতল রাস্তার উপর বাইসিকেল চালাইতে চালাইতে পা চালান বন্ধ করিয়া দিলেও ফ্রি-হুইলের সাহায্যে গাড়ী বরাবর চলিতেই থাকিবে—আর থামিবে না। সমুদ্রের উপর জাহাজগুলি চলিতে চলিতে বাষ্প বন্ধ করিয়া দিলেও উহা হুস্‌হুস্ করিয়া চলিতেই থাকিবে। মোটের উপর গতি একবার আরম্ভ হইলে আর থামিবে না।

ভাবিয়া দেখ তোমরা যাহাকে অতি সামান্য মনে কর

বা যাহাকে গ্রাহ্যই কর না তাহার অভাবে কত বিপদের সম্ভাবনা ; কিন্তু ঘর্ষণজনিত বাধা বন্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সুতরাং স্কুলে যাইবার জন্য বাহির হইয়া সত্যসত্য বিপদে পড়িবারও কোন ভাবনা নাই।

ভিজা কাপড় হাওয়ায় শুকায় কেন ?

একটি চায়ের পিরীচে যদি একটুখানি জল রাখিয়া দাও তবে পরদিন দেখিবে যে উহাতে আর জল নাই। জল কোথায় গেল বলত ? তুমি বলিবে "জল শুকাইয়া গিয়াছে।" কিন্তু "শুকাইয়া গিয়াছে" এ কথার অর্থ কি ? জল আপনাআপনি পিরীচ হইতে কোথাও চলিয়া গিয়াছে ; সেজন্য আমরা বলি জল শুকাইয়া গিয়াছে। জল পিরীচে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া উহা নষ্ট হয় নাই। জল সমস্ত দিন-রাত্রি ধরিয়া ধীরে ধীরে অদৃশ্য বাষ্প হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এইরূপ জলবাষ্প সর্ব্বদাই বাতাসের সহিত মিশিয়া থাকে।

জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে উহাকে গরম করিতে হয়—অর্থাৎ সেজন্য উত্তাপের আবশ্যক। আবার

৬২৮৯১

বাষ্প হইতে উত্তাপ কমাইলে—অর্থাৎ তাহাকে ঠাণ্ডা করিলে—বাষ্প জমাট বাঁধিয়া বা ঘনীভূত হইয়া জলকণায় পরিণত হয়। বৃষ্টি, কুয়াসা ইত্যাদির ইহাই কারণ। বৃষ্টি ও কুয়াসার কথা পরে বলিব। তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিও যে ঘরে দুই গেলাস জল রাখিয়া উহার একটির মধ্যে কয়েক খণ্ড বরফের টুকরা ফেলিয়া দিলে ঐ গেলাসের বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা জমিয়া যাইবে; কারণ ঐ গেলাসের চারিদিকে যে বাতাস লাগিতেছে সেই বাতাসের মধ্যে যে জলবাষ্প আছে তাহার উত্তাপ ঠাণ্ডা গেলাসের গায়ে লাগিয়া যথেষ্ট কমিয়া যাওয়ায় উহা ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া গেলাসের গায়ে জমিয়া গিয়াছে। অন্য গেলাসের জল তত ঠাণ্ডা নয় বলিয়া তাহার চারিদিকে জলকণা ঘনীভূত হইতে পারে নাই।

জলের বাষ্পে পরিণত হওয়া প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে; (১) **জলের উত্তাপ,**—তুমি পিরীচে যতটা জল লইয়াছিলে ততটা বাষ্পীভূত হইতে যদি ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিয়া থাকে, তবে ঐ জলকে সামান্য গরম করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে বাষ্পীভূত হইয়া যাইবে। (২) **জলের উপরিভাগের বিস্তার,**—তুমি যতটা জল পিরীচে রাখিয়াছিলে ঠিক ঐ পরিমাণ জল যদি পিরীচে না রাখিয়া একটি মুখখোলা শিশির মধ্যে রাখিতে, তবে তাহা বাষ্পীভূত হইতে অনেক দেরী হইত; এবং

শিশির মুখ খোলা না রাখিয়া যদি ছিপি দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে, তবে উহা আদৌ বাষ্পীভূত হইত না। আবার যদি ঐ পরিমাণ জল পিরাচে না রাখিয়া মেঝের উপর ছিটাইয়া দিতে তবে তাহা খুব শীঘ্র বাষ্পীভূত হইয়া যাইত। (৩) জলের উপরিভাগের হাওয়া পুনঃপুনঃ পরিবর্ত্তন,—পিরাচে জল রাখিয়া যদি পাখা দিয়া হাওয়া করিতে,—অর্থাৎ জলের উপরের হাওয়া বারবার বদলাইয়া দিতে, তবে উহা আরও শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পীভূত হইত। এই জন্য গরম জল বা গরম দুধ শীঘ্র ঠাণ্ডা করিতে হইলে উহার উপর হাওয়া করিতে হয়।

এইবার ভিজা কাপড় শুকাইবার কারণ নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ। কাপড়ের ভিতর যে জল থাকে তাহা বাষ্পীভূত হইলেই কাপড় শুকায়। যদি কাপড় শীঘ্র শুকাইয়া লইতে চাও তবে কি করিবে বল ত? যে যে উপায়ে জল শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পীভূত হয় সেই সেই উপায় অবলম্বন করিলেই কাপড় শীঘ্র শুকাইবে—অর্থাৎ (১) কাপড় ঘরের মধ্যে বা ছায়ায় না রাখিয়া রৌদ্রে বা আগুনের কাছে রাখিলে শীঘ্র শুকাইবে; (২) এক জায়গায় জড় না করিয়া কাপড় ভাল করিয়া বিছাইয়া দিলে শীঘ্র শুকাইবে; এবং (৩) যেখানে জোরে হাওয়া বহিতেছে সেখানে বিছাইয়া দিলে আরও শীঘ্র শুকাইবে।

তোমরা দেখিয়াছ যে বর্ষার দিনে কাপড় শীঘ্র শুকায়

না—ইহার কারণ কি ? নানা জায়গা হইতে সর্ব্বদা জল বাষ্পীভূত হইয়া হাওয়ার সহিত মিশ্রিত হয়, সেজন্য হাওয়াও সর্ব্বদা ভিজা থাকে—তবে কখনও কম কখনও বেশী। হাওয়ার ভিতর জলবাষ্পের পরিমাণ অধিক থাকিলে তাহাকে ভিজা হাওয়া ও খুব কম থাকিলে তাহাকে শুষ্ক হাওয়া বলি। যখন চারিদিকের হাওয়া খুব ভিজা থাকে—অর্থাৎ উহার অবস্থা এরূপ থাকে যে আর অধিক জলবাষ্প ঐ হাওয়ার ভিতর থাকিতে পারে না, সেরূপ হাওয়ার সংস্পর্শে জল শীঘ্র বাষ্পীভূত হয় না। বর্ষার দিনে হাওয়ার অবস্থা প্রায়ই এরূপ থাকে বলিয়া জল বাষ্পীভূত হইতে পারে না ; সুতরাং কাপড়-চোপড় শীঘ্র শুকায় না।

আর একটি বিষয় তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে স্নান করিয়া উঠিলেই তখন ঠাণ্ডা বোধ হয়। অথবা কেবল হাত বা পা জলে ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলেও ঠাণ্ডা বোধ হয়। গায়ে বা হাত পায়ে যে জল লাগিয়া থাকে উহা বাষ্প হইয়া যায় ; এবং উহাই ঠাণ্ডা বোধ হইবার কারণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে জল বাষ্পীভূত হইতে উত্তাপের আবশ্যক হয়। জলে হাত ডুবাইয়া উঠাইবার পর বা স্নান করিবাব পর আমাদের গায়ে যে জল লাগিয়া থাকে উহা বাষ্পীভূত হইবার জন্য আমাদের দেহ হইতে উত্তাপ লয় ; এবং দেহ হইতে কিছু উত্তাপ নষ্ট হয় বলিয়া আমরা ঠাণ্ডা বোধ করি। গায়ে যখন ঘাম থাকে তখন হাওয়া করিলে অধিক

ঠাণ্ডা বোধ করি কারণ তখন জল আরও শীঘ্র শীঘ্র বাষ্পে পরিণত হয়। জলের পরিবর্ত্তে হাত পেট্রোলের মধ্যে ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলে আরও অধিক ঠাণ্ডা বোধ হয়; কারণ পেট্রোল জল হইতে অনেক তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়।

গরমকালে কোন ধাতুপাত্রের পরিবর্ত্তে মাটির কুঁজোর ভিতর জল রাখিলে উহা বেশী ঠাণ্ডা হয় কেন বল দেখি? ধাতুপাত্রের কেবল মুখ হইতে জল বাষ্পীভূত হইতে পারে; কিন্তু কুঁজোর সকল গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে বলিয়া উহার চারিদিক হইতে জল বাষ্পীভূত হয়। সেজন্য ভিতরের জল হইতে অধিক উত্তাপ নষ্ট হয়, সুতরাং জলও অধিক ঠাণ্ডা হয়।

মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা ও শিশির

তোমরা জান যে একটি হাঁড়িতে খানিকটা জল দিয়া উনানের উপর রাখিয়া দিলে উনানের আগুনে গরম হইয়া উহা শীঘ্রই ফুটিতে আরম্ভ করে, এবং কিছুক্ষণ পরে উহা একেবারে শুকাইয়া যায়। শুকাইয়া যাওয়ার অর্থ বাষ্পে

পরিণত হওয়া তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। একটি চায়ের পিরাচে বা একখানি থালায় জল রাখিলেও উহা ক্রমে বাষ্পে পরিণত হয় কিন্তু অনেক দেরী লাগে। গরম করিলে জল খুব শীঘ্রই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। এই বাষ্প জলের খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। মাটি, পাথর, কাঠ, লোহা, সোণা, পিতল, কাঁসা, তেল, জল ইত্যাদি পৃথিবীর সব জিনিষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত। এই কণিকাগুলি এত ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা দূরে থাক, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের কোনরূপ যন্ত্রের সাহায্যেও ইহাদের দেখিতে পান নাই। তাঁহারা এই কণিকাগুলির নাম দিয়াছেন '**অণু**'। একখণ্ড লোহা লইয়া তাহাকে খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত খুব সূক্ষ্ম কণিকায় পৌঁছিলে তাহাকেই লোহার অণু বলে। লোহা যেমন লোহার অণুর সংযোগে তৈরী সেইরূপ সোণা সোণার অণু, জল জলের অণু দ্বারা, এবং অন্যান্য জিনিষও তাহাদের অতি সূক্ষ্ম অংশের অর্থাৎ অণুর দ্বারা তৈরী। এই অণুগুলি এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে না, সর্ব্বদাই এদিক-ওদিক ছুটাছুটি ও নিজেদের মধ্যে ধাকাধাকি করে। গরম পাইলে সকল জিনিষের অণুগুলির নিজেদের মধ্যে ছুটাছুটির ও ধাকাধাকির জোর বাড়িয়া যায়, এবং ক্রমে তাহারা পরস্পর হইতে বেশী ফাঁকফাঁক হইতে চায়। লোহা, পাথর ইত্যাদি কঠিন জিনিষের অণু অপেক্ষা জল,

দুধ ইত্যাদি তরল জিনিষের অণুগুলি অল্প গরমেই সহজেই অধিক ফাঁকফাঁক হইয়া যায়, এবং অবশেষে ধাক্কাধাক্কির ফলে কতকগুলি নিজেদের দল ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়। হাঁড়িতে জল গরম করিলে হাঁড়ি হইতে এইরূপে জলের অণু নিজেদের দল ছাড়িয়া বাহিরের বাতাসে মিশিয়া যায়। হাঁড়ি হইতে ক্রমে যতই অণুর দল বাহিরে আসিবে ততই হাঁড়ির জল কমিয়া যাইবে, এবং ক্রমে সবগুলি বাহিরে আসিলে আমরা বলি যে জল শুকাইয়া গিয়াছে। এই সব বাহিরে আসা জলের অণুগুলির সমষ্টিকে আমরা **জলবাষ্প** বলি। ইহাদের চোখে দেখা যায় না কিন্তু যখন অনেকগুলি একসঙ্গে মিলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় তখন উহাদিগকে দেখা যায়। ঠাণ্ডা পাইলে জলের বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা হইয়া যায়। এইজন্যই বরফজল ভরা গেলাসের গায়ে ছোট ছোট জলকণা জমিয়া যায়। কেট্‌লিতে চায়ের জল গরম করিবার সময় উহার নল দিয়া ধোঁয়ার মত যাহা বাহির হয় তাহা বাহিরের ঠাণ্ডায় এরূপ জমাট বাঁধা জলবাষ্প মাত্র। তাই আমরা দেখিতে পাই হাঁড়িতে ফুটন্ত জলের কিছু উপরে কাঁসার থালা বা গেলাস রাখিলে তাহার গায়েও এইরূপ অনেক জলবিন্দু জমিয়া যায়।

শুধু যে আগুনে গরম করিলেই জল বাষ্প হয় তাহা নয়। নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পুষ্করিণী, খাল, বিল ইত্যাদির জল

সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া প্রত্যহই বাষ্পীভূত হইতেছে। তোমরা জান যে পৃথিবীর স্থলের ভাগ অপেক্ষা জলের ভাগ প্রায় তিন গুণ। এই সব জল হইতে প্রতিদিন কত জল-বাষ্প তৈরী হইতেছে। এই অদৃশ্য বাষ্প সর্ব্বদাই বায়ুর সহিত মিশিয়া আছে। বায়ুতে এই বাষ্পের পরিমাণ কখনও কম এবং কখনও বেশী থাকে। কিন্তু যতই বেশী থাকুক না কেন আমরা উহা দেখিতে পাই না। কোনরূপে ঐ বাষ্পের উত্তাপ কম হইলে ক্রমে উহা ঘনীভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয়। এই জলবিন্দু-গুলির প্রত্যেকটি এত ক্ষুদ্র যে উহাও আমরা দেখিতে পাই না—হয়ত প্রায় ৩০০০ হাজার জলবিন্দুকে পাশাপাশি রাখিলে তবে উহারা মাত্র এক ইঞ্চি লম্বা স্থান দখল করে। ইহাদের প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এইরূপ কোটি কোটি জলবিন্দু যখন আমাদের চারিদিকে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় তখন উহাদের সমষ্টিকে আমরা দেখিতে পাই এবং উহাকে কুয়াসা বলি।

শীতকালে সকালবেলা জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া তোমরা সকলেই যে এরূপ কুয়াসা সৃষ্টি করিতে পার তাহা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ। ফুস্‌ফুসের ভিতর বাতাস গরম থাকে, সেজন্য সেখানে জলীয় অংশ বাষ্পীভূত হয়, এবং উহা প্রশ্বাসের সহিত বাহিরে আসে। শীতকালে বাহিরের বাতাস খুব ঠাণ্ডা থাকে, সেজন্য ভিতর হইতে বাহিরে

আসিয়া কতক জলবাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং কুয়াসা সৃষ্টি করে।

আবার রাত্রের ঠাণ্ডায় ঘনীভূত বাষ্প জলবিন্দুর আকারে যখন গাছের পাতায় বা ঘাসের উপর জমিয়া থাকে তখন উহাকে **শিশির** বলা হয়। যখন কোটি কোটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা বাতাসের সহিত উপরে উঠিয়া অনেক উচ্চে আকাশে ভাসিয়া বেড়ায় তখন আকাশে ভাসমান সেই অসংখ্য জলকণার সমষ্টিকেই আমরা মেঘ বলি। জলকণা-গুলি কি করিয়া অত উচ্চে উঠিতে পারে বল দেখি ?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলবাষ্প বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়। ভূপৃষ্ঠের বাতাস অপেক্ষাকৃত গরম, এবং গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাস অপেক্ষা হাল্কা। সেজন্য ভূপৃষ্ঠের গরম বাতাস যখন উপরে উঠে তখন সেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তন্মধ্যস্থ জলবাষ্পও উপরে উঠে। নীচের বাতাস যতই উপরে উঠিতে থাকে ততই ইহার উপরে উপরের বাতাসের যে চাপ থাকে তাহা কমিতে থাকে, এবং সেজন্য ইহার আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কেন না তোমরা জান যে, কোন জিনিষের উপর চাপ দিলে তাহার আয়তন কমিয়া যায়। আবার ঐ চাপ ক্রমশঃ ছাড়িয়া দিলে আয়তন বাড়িতে থাকে। বাতাস বা অন্য কোন বায়বীয় পদার্থের উপর চাপ দিলে তাহাদের আয়তন কঠিন বা তরল পদার্থ অপেক্ষা খুব বেশী কমে ; আবার চাপ কমাইলে আয়তনও বেশী বাড়ে। ভূপৃষ্ঠ হইতে

উপরে বরাবর প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ মাইল এমন কি তাহারও অনেক উপর পর্য্যন্ত বাতাস থাকে; সেজন্য ভূপৃষ্ঠের বাতাসের উপর চাপ খুব বেশী থাকে। নীচের বাতাস যতই উপরে উঠিতে থাকে ততই উপরের চাপ কমিতে থাকে। বাতাসের বা যে কোন বাষ্পের আয়তন হঠাৎ বর্দ্ধিত হইলে উহা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হয়। নীচের বাতাস যতই উপরে উঠে ততই ইহার চাপ কমিয়া যাওয়ায় ইহা প্রসারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়। যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইলে উহার সংস্পর্শে জলবাষ্প ঘনীভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া মেঘ সৃষ্টি করে। হাওয়ায় একদিকের মেঘ অন্য মেঘখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে এত গাঢ় হয় যে তখন সূর্য্যালোকও ঢাকিয়া দেয়। এইরূপে একটি জলবিন্দু আর একটি বিন্দুর সহিত মিশিয়া অপেক্ষাকৃত বড় বিন্দুতে পরিণত হয়। জলকণা বড় হইয়া গেলে তখন আর বাতাসে ভাসিতে না পারিয়া নীচে পড়িতে আরম্ভ করে, এবং মেঘের ভিতর দিয়া পড়িবার সময় অন্যান্য জলকণার সহিত মিলিত হইয়া আরও বড় হইয়া উঠে। তখন এই সকল অসংখ্য বড় বড় জলের ফোঁটা পৃথিবীর উপর পতিত হয়। ইহারই নাম বৃষ্টি।

বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সব সমান নয়; কতকগুলি খুব ছোট ছোট, আবার কতকগুলি এত বড় যে তাহাদের দশ

পনেরটিকে পাশাপাশি রাখিলে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়। উপরের জলবাষ্প ঘনীভূত হইবার সময় যদি খুব বেশী ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আসে তবে উহা আর জলকণায় পরিণত হয় না। জলকণাগুলি জমিয়া একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বরফের টুক্‌রায় পরিণত হয়। এইগুলি ভূপৃষ্ঠে পড়িলে আমরা **শিলাবৃষ্টি** বলি।

বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া কোথায় যায়? কতক মাটির ভিতর শুষিয়া যায়, কতক মাটির ভিতর গিয়া ভূগর্ভস্থ জলস্রোতের সহিত মিশিয়া কোন ঝরণা বা কূপাদিতে পতিত হয়, কতক গড়াইয়া ছোট ছোট খালবিলে পড়ে এবং সেখান হইতে ছোট নদী ও ক্রমে বড় নদীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সাগরে গিয়া মিলিত হয়। আবার সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত হইয়া খাল, বিল, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি সকল জায়গা হইতেই জল বাষ্পীভূত হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া উপরে গিয়া মেঘ সৃষ্টি করে, এবং পুনরায় বৃষ্টিধারারূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। জলের এইরূপ যাওয়া আসা সেই আদিমকাল হইতে বরাবর চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই জগৎ রক্ষা হইতেছে, নতুবা নদী, হ্রদ, সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ও ফলফুলে সুশোভিত আমাদের এই পৃথিবী ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইত; কোথাও বৃক্ষ-লতা জীব-জন্তুর চিহ্ন মাত্র থাকিত না।

জল বাষ্পীভূত না হইলে কি ক্ষতি হইত ?

জ্যৈষ্ঠ মাস। মনে কর জলের বাষ্পীভবন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ জলকে যতই গরম কর উহা আর বাষ্পে পরিণত হইতেছে না। গরমে তোমার হাত পা মুখ সব ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে, পাখার বাতাস করিলেও ঘাম শুকাইতেছে না। তুমি রুমাল দিয়া হাত পা ও মুখের ঘাম মুছিতেছ। দুই একবার মুছিতে মুছিতে রুমাল ভিজিয়া গেল। শুকাইবার জন্য রুমালখানি টাঙ্গাইয়া দিলে। যদিও বাতাস বেশ বহিতেছে এবং রৌদ্রের তেজে বাহিরের দিকে চাওয়া যায় না, তথাপি রুমাল একটুও শুকাইল না; কারণ জল বাষ্পীভূত না হইলে রুমাল কি করিয়া শুকাইবে? ঘামে তোমার কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গেল। তখন ভিজা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া শুক্‌নো কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইতে দিলে। যতই অপেক্ষা কর সে কাপড়-চোপড় কিছুই শুকাইল না, কিন্তু যে কাপড় পরিয়াছ তাহাও আবার ভিজিয়া গেল।

তখন বিরক্ত হইয়া আগুন জ্বালাইয়া কাপড় জামা শুকাইবার চেষ্টা করিলে। কোনই ফল হইল না, কাপড় যেমন ভিজা ছিল তেমনই রহিল। এইরূপে এক কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাপড় পরায় ক্রমে তোমার সব কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল। তখন অগত্যা দুই একদিনে ভিজা কাপড়ে থাকা তোমার অভ্যাস হইয়া গেল; কিন্তু সুখের বিষয় ঘাম বাষ্পীভূত হইবে না বলিয়া দেহের উত্তাপ কিছু নষ্ট হইবে না, সুতরাং তোমার সর্দ্দি লাগিবার ভয় থাকিবে না।

এ সমস্ত ছাড়া আর এক বিষম বিপদের বিষয় চিন্তা কর। জল বাষ্পীভূত না হইলে আকাশে মেঘের সৃষ্টি হইবে না, সুতরাং বৃষ্টিও হইবে না। ক্রমে ক্রমে পুকুর, কূয়া, নদী প্রভৃতির জল মাটির ভিতর শুষিয়া যাইবে কিন্তু বৃষ্টি নাই বলিয়া তাহারা আর জল পাইবে না; সুতরাং ক্রমে সব শুষ্ক হইয়া যাইবে। আর কি হইবে বল ত? মেঘের চিহ্ন না থাকাতে সূর্য্য-কিরণ অতি তীক্ষ্ণ হইবে, কুয়াসা আর দেখিতে পাইবে না, সকালে ঘাস পাতার উপর আর শিশির পড়িবে না, হিমালয় পাহাড়ের উপর বরফ জমিবে না; আর পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, নদী, হ্রদ, পুকুর, ঝরণা কোথাও জলের চিহ্ন থাকিবে না। তখন পিপাসা লাগিলে কি করিবে বল ত? অবশ্য তখন পিপাসা অনেক কম হইবে এবং সে সামান্য পিপাসা আক ইত্যাদি রসাল গাছ-গাছড়া হইতে মিটাইতে পারিবে?

ক্রমে নদী, হ্রদ ইত্যাদির জল যাহা মাটির ভিতর শুষিয়া গিয়াছিল তাহাও অনেক নীচে চলিয়া যাইবে, সুতরাং তখন গাছ-গাছড়াও আর বাঁচিবে না; দেশ মরুভূমিতে পরিণত হইবে এবং ক্রমে কোথাও জীবনের চিহ্ন থাকিবে না। তোমরা ভীত হইও না কারণ আপাততঃ এরূপ বিপদের কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু তোমরা কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি যে ভগবানের রাজ্যে নিয়ম-কানুনের সামান্য ব্যতিক্রম হইলে কত অনর্থ ঘটিতে পারে?

সমুদ্রের জল লোণা কেন?

তোমাদের মধ্যে যাহারা পুরী গিয়াছ তাহারা দেখিয়াছ যে সমুদ্রের জল ভয়ানক লোণা। নদীর জলও এক এক সময় খুব লোণা হয়। তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ যে পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। এত জলকে লবণাক্ত করিতে গেলে কত লক্ষ লক্ষ বস্তা লবণের দরকার বল ত? ইহা তুমি হিসাব করিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার পরিমাণ যে অনেক ইহা বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জলের মধ্যে এত লবণ কোথা হইতে আসিল যাহা এই বিশাল জলরাশিকে এইরূপ

লবণাক্ত করিতে পারিল—একথা হয়ত তোমরা অনেক সময় ভাবিয়াছ। কি করিয়া সমুদ্রের জল অন্যান্য নদী দ্বারা সরবরাহ হয় তাহা জানিলে সমুদ্রের জল লোণা হওয়ার কৈফিয়ৎ অনেক সহজ হইয়া আসে। তোমরা জান যে বৃষ্টি হইলে উহা পাহাড়-পর্ব্বত ও ভূপৃষ্ঠের নানা স্তর ধুইয়া লইয়া নদীতে পড়ে। পুরাকালে অনেক লবণাক্ত পাহাড় ভূপৃষ্ঠে খাড়া ছিল, এখনও চারিদিকে এইরূপ লবণময় অনেক পাহাড় আছে। আমাদের দেশে রাজপুতানায় এইরূপ লবণ পাহাড় আছে। তাহা ছাড়া মাটির ভিতর বিভিন্ন স্তরে অনেক লবণ জমা থাকে। বৃষ্টির জলে সেই সব ধুইয়া আসিয়া নদীতে পড়ে এবং পরে উহাই আবার সমুদ্রে গিয়া জমা হয়। অনেকে আবার বলেন যে পৃথিবী-সৃষ্টির আদিম কালে চারিদিকে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি ছিল এবং তখন প্রায়ই তাহাদের উৎপাত লাগিয়া থাকিত। ঐ সকল আগ্নেয়গিরির উৎপাতের ফলে ভূগর্ভের লবণ সমূহ জলীয় বাষ্পের সহিত নিক্ষিপ্ত হইত এবং উহাই ক্রমে নদী প্রভৃতির দ্বারা সমুদ্র গর্ভে বাহিত হইয়াছে।

তাহার পর এতদিন ধরিয়া সমুদ্রের জল সূর্য্যের তেজে ক্রমাগত বাষ্পীভূত হইতেছে, কিন্তু উহার লবণ সমুদ্র গর্ভেই জমা হইতেছে। এইরূপে কত কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া সমুদ্র গর্ভে রাশিরাশি লবণ সঞ্চিত হইতেছে। নদী ও হ্রদ যে লবণ পায় তাহা ক্রমে সমুদ্রকে দান করে এবং ঐ লবণ

আর সমুদ্র হইতে বাহির হইতে পারে না। পৃথিবীর বয়স যতই বাড়িতেছে ততই এইরূপে বিভিন্ন নদী প্রভৃতির দ্বারা পুষ্ট হইয়া সমুদ্রগুলির লবণের ভাগ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। এজন্য সমুদ্রের জল আগুনে শুকাইলে অতি সহজেই প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। যদি কোন যাদুকর দ্বারা অদ্ভুত উপায়ে সমগ্র সমুদ্রভাগের সকল জল শুকাইয়া ফেলা যায় তবে তাহাতে যত লবণ পাওয়া যাইবে, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার দ্বারা সমস্ত ভূখণ্ডকে দুইশত ফিট উঁচু করিয়া ছাইয়া ফেলা সম্ভব হয়।

—:o:—

সহরে কি উপায়ে জল সরবরাহ হয়

তোমাদের মধ্যে যাহারা সহরে বাস কর বা যাহারা সহরে কখনও বেড়াইতে গিয়াছ তাহারা দেখিয়াছ যে সেখানে প্রত্যেক বাড়ীতে জলের কলের চাবি ঘুরাইলেই হুড়হুড় করিয়া জল পড়ে; কিন্তু কি উপায়ে প্রত্যেক বাড়ীতে একসঙ্গে জল সরবরাহ হইতেছে তাহা জান কি?

একটি সামান্য পরীক্ষার দ্বারা এই ব্যাপারটি অতি সহজেই বুঝিতে পারিবে। একটি কাচের নল একটি রবারের নল ও একদিকে সরু নল বিশিষ্ট আর একটি

পাত্র লও। রবারের নলটির এক মুখ কাচের নলে ও অপর মুখ পাত্রটির নলে লাগাও (১নং চিত্র দেখ)।
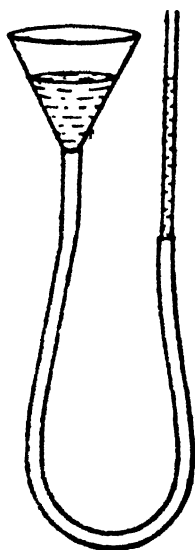
১নং চিত্র

ডান দিকের পাত্রটির ও বাঁ-দিকের কাচের নলের ভিতরের জলের উচ্চতার প্রভেদের উপর নল হইতে নির্গত জলের বেগ নির্ভর করে।

পাত্রটি একটু উঁচু জায়গায় রাখিয়া কাচের নলটি ঐ পাত্রের সমান উঁচুতে রাখ ও পাত্রে জল ঢাল। দেখ যে পাত্রের ভিতর ও নলের ভিতর জল ঠিক একই সমতলে আছে। এইবার কাচের নলটি (চিত্রের ডানদিকে) যতই উঁচু কর উহার ভিতরের জল কিন্তু আর উঁচুতে উঠিবে না. ঠিক সেই পর্য্যন্তই থাকিবে ; বাঁ-দিকের পাত্রে জল যত উচ্চে আছে, কাচের নলের ভিতরের জল তাহার অধিক উচ্চে উঠিতে পারিবে না। এখন কাচের নলটি যদি ক্রমে নীচে নামাও তাহা হইলেও জল একই জায়গায় থাকিবে। কিন্তু যদি কাচের নলটি বেশী লম্বা না হয়, অর্থাৎ নীচে নামাইবার সময় উহার অগ্রভাগ পাত্রমধ্যস্থ জলের নীচে আসিয়া পড়ে তখন জল কাচের নল হইতে বাহির হইয়া যাইবে এবং পূর্ব্বের

ন্যায় পাত্রমধ্যস্থ জলের সমান উচ্চে উঠিতে চেষ্টা করিবে। পাত্রমধ্যস্থ জল হইতে কাচের নলটি যত নীচে থাকিবে উহা হইতে জল তত অধিক জোরে নির্গত হইবে—অর্থাৎ পাত্রের জলের ও কাচের নলের **উচ্চতার প্রভেদের উপর নল হইতে নির্গত জলের বেগ নির্ভর করিবে।** সহরের কলের জল ঠিক এই উপায়ে সরবরাহ করা হয়।

সহরে জল সরবরাহ করিবার জন্য খুব উঁচু কোন জায়গার উপর একটি বৃহৎ লোহার পাত্র (গ) রাখা হয়, এবং নদী হইতে বা কোন বড় কূয়া হইতে জল পাম্প করিয়া ঐ পাত্রে ভরা হয় (২নং চিত্র দেখ)। সহরের প্রত্যেক
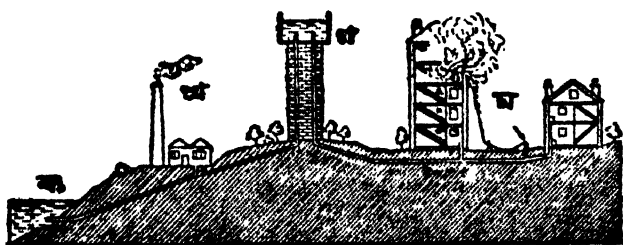
২নং চিত্র

সহরে কিরূপে জল সরবরাহ হয়। (খ)-এ বাষ্পশক্তি সাহায্যে পাম্প দিয়া জল উপরের চৌবাচ্চা (গ)-এ উঠিতেছে, এব সেখান হইতে নলের ভিতর দিয়া চারিদিকে যাইতেছে।

বাড়ীতে যে লোহার নল হইতে জল পড়ে সেই নল ঐ উঁচু জায়গায় রক্ষিত জলপূর্ণ পাত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে, এবং

সেজন্য ঐ নলের ভিতর দিয়া জল আসে। যে বাড়ী ঐ বৃহৎ জলপাত্র হইতে যত নীচু হইবে সেই বাড়ীতে জল তত জোরে পড়িবে, সেজন্য দোতালার উপরে জলের কল নীচের তলা হইতে অনেক উঁচুতে আছে বলিয়া সেখানে জল কম জোরে পড়ে। কোন বাড়ীর যেখানে কল আছে তাহার উচ্চতা সহরের যে স্থানে বৃহৎ জলপাত্রটি রক্ষিত আছে তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে, সেখানে জল যাইবে না।

কলিকাতা সহরে জল সরবরাহ করিবার জন্য টালায় যে প্রকাণ্ড লোহার ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চাটি আছে তাহা দেখিবার যোগ্য। যাহাতে সহরের উঁচু বাড়ীতেও জল উঠিতে পারে সেজন্য চৌবাচ্চাটিকে রাস্তা হইতে ৭০ হাত উঁচু লোহার থামের উপর রাখা আছে। উহাতে কত জল ধরে জান কি? এগার লক্ষ পঁচিশ হাজার মণ। শুনা যায় যে এত বড় জলের চৌবাচ্চা পৃথিবীর আর কোথাও নাই।

-ঃ০ঃ-

দিন অপেক্ষা রাত্রি ঠাণ্ডা কেন ?

দিন অপেক্ষা রাত্রি ঠাণ্ডা হইবার কারণ রাত্রিকালে সূর্য্য থাকে না। কিন্তু কেবল সূর্য্যের উপস্থিতি গরমের ও সূর্য্যের অনুপস্থিতিই যদি ঠাণ্ডার কারণ হয় তবে সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্তের পরই একেবারে খুব ঠাণ্ডা না হইয়া রাত্রি যত অধিক হয় ঠাণ্ডা তত বাড়িতে থাকে, ইহার কারণ কি ? সূর্য্যের অনুপস্থিতি ছাড়াও ইহার আর একটি কারণ আছে তাহা এই যে সমস্ত দিন ধরিয়া পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে তাপ গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশ রাত্রে পুনরায় ত্যাগ করে।

একটি বড় লোহার বলকে অনেকক্ষণ আগুনে রাখিবার পর যখন টক্‌টকে লাল হইবে তখন যদি উহাকে উঠাইয়া আনিয়া তোমার কাছাকাছি রাখা হয় তবে বলটি হইতে কিছুদূরে দাঁড়াইলেও উহার উত্তাপ তোমার গায়ে লাগিবে ও তুমি গরম বোধ করিবে। ইহার কারণ এই যে ঐ গরম বলটি হইতে তাপ চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে—অর্থাৎ ছড়াইয়া যাইতেছে। সেজন্য উহার কাছাকাছি যেদিকেই দাঁড়াও ঐ ছড়ানো তাপের কিয়দংশ তুমি গ্রহণ করিবে ও

গরম বোধ করিবে। বলটি যত অধিক সময় এইরূপে তাপ বিকিরণ করিবে উহার মোট তাপের পরিমাণ ততই কমিয়া যাইবে—অর্থাৎ উহা ক্রমেই ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

দিবাভাগে পৃথিবী সূর্য্য হইতে তাপ গ্রহণ করে এবং রাত্রে সেই তাপ বিকিরণ করিতে থাকে ; এইরূপে ক্রমশঃ তাপের পরিমাণ ক্ষয় হওয়াতে পৃথিবী রাত্রে ঠাণ্ডা হয়। সূর্য্য যখন আমাদের ঠিক মাথার উপর থাকে পৃথিবী তখন সূর্য্য হইতে খুব বেশী তাপ পায়, কারণ সে সময় সূর্য্য ও পৃথিবীর দূরত্ব সব চেয়ে কম থাকে। সকালে ও বৈকালে দূরত্ব অধিক থাকে বলিয়া পৃথিবী সে সময় অপেক্ষাকৃত কম তাপ পায়। পৃথিবী দিবাভাগে শুধু যে তাপ গ্রহণ করে তাহা নয়, তাপ বিকিরণও করে। সকালে ও বিকালে লাভের মাত্রা অপেক্ষা ক্ষয়ের মাত্রা কিছু অধিক, কিন্তু দ্বিপ্রহরে লাভের মাত্রা অনেক অধিক থাকে। এজন্য সারাদিনই মোটের উপর গরম থাকে। রাত্রে লাভের মাত্রা কিছুই নাই, শুধুই ক্ষয়। সেজন্য রাত্রির শেষভাগই অধিক ঠাণ্ডা ; কারণ ততক্ষণে পৃথিবীর অনেক উত্তাপ ক্ষয় হইয়া যায়।

অন্যান্য সময় অপেক্ষা শীতকাল ঠাণ্ডা হইবার একই কারণ। শীতকালে দিন খুব ছোট এবং রাত্রিকাল বড় থাকে। এজন্য দিবাভাগে পৃথিবী সূর্য্য হইতে যে পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে রাত্রিকালে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে

বিকিরণ করে। ইহাতে গ্রীষ্মকালে পৃথিবীতে যত তাপ সঞ্চিত হইয়াছিল শীতকালে ক্রমে তাহা কমিতে আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া তোমরা দেখিও যে শীতকালে সূর্য্য ঠিক মাথার উপর আসে না, বরাবর একদিকে হেলিয়া থাকে। এই কারণে পৃথিবী দিবাভাগে খুব কম তাপ লাভ করে অথচ রাত্রে অনেক বেশী তাপ হারায়। গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত তাপের পরিমাণ শীতকালের প্রারম্ভ হইতে এইরূপে ক্ষয় হইয়া অবশিষ্টাংশ পৌষমাসের মাঝামাঝি প্রায় শেষ হইয়া যায়। সেজন্য এই সময়ে প্রায়ই খুব বেশী শীত পড়ে।

জল জিনিষটা কি ?

ছোটবেলায় জ্ঞান হইবার পর হইতে যখন তোমরা মানুষ, গরু, গাছ-পালা, মাটি, জল ইত্যাদি নূতন নূতন জিনিষ দেখিয়াছ তখন হইতে বাবা, মা, দাদা, দিদি ইত্যাদি সকলকে 'এটা কি' 'ওটা কি' জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছ। এইরূপে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ক্রমে জগতের অনেক জিনিষের সহিত—বিশেষতঃ যেগুলি রাতদিন দেখিতে পাও তাহাদের সহিত—তোমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে।

তারপর একটু বড় হইয়া বই পড়িয়াও অনেক পরিচয় পাইয়াছ। কিন্তু জন্মের পর হইতে এপর্য্যন্ত প্রত্যহই দেখিয়া আসিতেছ এবং যাহা না হইলে কাহারও একদিনও চলে না এমন একটি জিনিসের পরিচয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। বলত জল জিনিসটা কি? ইহা কি দিয়া তৈরী? ভাত রুটি কি দিয়া তৈরী সে সব খবর নিশ্চয়ই জান; কিন্তু এসব জিনিষের সহিত দেখা হইবার বহু পূর্ব্বেই যাহার সহিত দেখাশুনা হইয়াছে তাহার প্রকৃত পরিচয় জান কি? তোমরা হয়ত বলিবে "জল আবার কি দিয়া তৈরী? জল জল দিয়া তৈরী।" কিন্তু ইহা ঠিক নয়। অবশ্য বহুকাল পূর্ব্বে সকলের এরূপ বিশ্বাস ছিল বটে যে যেমন সোণা, রূপা, লোহা, তামা ইত্যাদি এবং উদজান (Hydrogen) ও অম্লজান (Oxygen) বাষ্প ইত্যাদির ভিতর একটি ছাড়া আর কোন জিনিষ নাই তেমনি জলের ভিতরও জল ছাড়া আর কোন জিনিষ নাই। সোণা বা লোহা ভাঙ্গিলে সোণা বা লোহা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহারা অন্য আর কোন পদার্থ মিশাইয়া তৈরী নয়। এরূপ পদার্থকে বৈজ্ঞানিকরা মৌলিক পদার্থ বলেন; অর্থাৎ সোণা, রূপা, লোহা, তামা, উদজান, অম্লজান সবই মৌলিক পদার্থ। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব নিকাশ করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন যে জগতে

সবশুদ্ধ মাত্র বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থ আছে, আর তোমরা যে গাছপালা, পাহাড়-পর্ব্বত, মানুষ-গরু, চাউল, আটা, চিনি, গুড়, কাগজ, পেন্‌সিল ইত্যাদি নানা প্রকার জিনিষ দেখ ইহাদের সবগুলিই ঐ বিরানব্বুইটি মৌলিক পদার্থের দুইটি কিংবা তাহার অধিক লইয়া তৈরী হইয়াছে। ইহাদিগকে যৌগিক পদার্থ বলে। বহু পূর্ব্বে জল ও বাতাস দুইটিকেই সকলে মৌলিক পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিত; কিন্তু অনেকদিন হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে জল ও বাতাস উভয়ই যৌগিক পদার্থ।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে জল—যাহাকে আমরা তরল পদার্থ বলি এবং যাহাকে সহজে হাতে করিয়া রাখা যায় অথবা এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা যায় তাহা—বাতাসের মত দুইটা গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থের সংযোগে তৈরী। ইহাদের একটি নাম উদজান (Hydrogen) ও অপরটির নাম অম্লজান (Oxygen) গ্যাস। তোমরা বোধ হয় ইহা শুনিয়া হাসিতেছ। ভাবিতেছ ইহা কি হইতে পারে। বাতাসের মত হাল্‌কা দুইটা বায়বীয় পদার্থ মিলিয়া জল হইয়া যায় ইহা কি বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু তোমাদের চোখের সম্মুখে পরীক্ষা করিয়া দেখান যায় যে ইহা অতি সত্য, এবং তোমরা পূর্ব্বেই ইহা অনেকবার দেখিয়াছ, কিন্তু লক্ষ্য কর নাই।

কেট্‌লিতে জল লইয়া গরম করিবার জন্য আগুনের উপর রাখিলে একটু পরেই দেখা যায় যে কেট্‌লির গায়ে ছোট ছোট জলবিন্দু জমিয়া রহিয়াছে। জলের কেট্‌লির বদলে অন্য কোন ঠাণ্ডা জিনিষ আগুনের উপর ধরিলেও এইরূপ দেখা যায়। এই জলবিন্দু কোথা হইতে আসিল? তোমরা হয়ত বলিবে. যে সকল খুব ছোট ছোট জলবিন্দু বাতাসের ভিতর ভাসিতেছিল তাহারা কেট্‌লির গায়ে লাগিয়া ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হইয়া সেখানেই বসিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্য নয়. কারণ তাহা হইলে কেট্‌লিকে আগুনের উপর বসাইবার ত কোন দরকার ছিল না। বাতাসের ভিতরের জলবিন্দু হইলে তাহারা পূর্ব্বেই ত স্বচ্ছন্দে কেট্‌লির গায়ে·বসিতে পারিত।

ইহার প্রকৃত কারণ এই যে কাঠ, কয়লা বা অন্য যে কোন জিনিষ জ্বালাইয়া আগুন কর উহাদের ভিতর উদজান নামক বাষ্প থাকে। উহারা জ্বলিবার সময় উহাদের ভিতর হইতে ঐ উদজান বাষ্প বাহির হইয়া আসে। আর বাতাসের ভিতর যথেস্ট (বাতাসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ) অম্লজান বাষ্প আছে। এই উদজান ও অম্লজান বাষ্প মিশিয়া জল তৈরী হয় এবং তাহারাই কেট্‌লির গায়ে জমিয়া যায়।

আর একটি পরীক্ষার কথা বলিতেছি। তিন চার ইঞ্চি লম্বা একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া টেবিলের উপর বা একটি বাতিদানের উপর সোজা করিয়া রাখ। এইবার একটি

শুষ্ক কাচের গেলাস উপুড় করিয়া ঐ বাতির শিখার উপর ধর। দেখিবে যে গেলাসের ভিতর শিশিরবিন্দুর মত ছোট ছোট জলকণা জমিয়া গিয়াছে এবং একটু পরেই উহারা বড় হইয়া গেলাসের গা বাহিয়া গড়াইয়া পড়িবে। ইহারও একই কারণ। বাতির ভিতর হইতে উদজানবাষ্প বাহির হইয়াছে এবং উহা বাতাসের অম্লজান বাষ্পের সহিত মিশিয়া জলবিন্দু তৈরী করিয়াছে।

উদজান ও অম্লজান বাষ্প মিশিয়া জল তৈরী হইয়া গেলাসের গায়ে জমিয়াছে।

একটি কাচপাত্রে জল লইয়া উহার ভিতর তড়িৎ চালাইলে তড়িৎশক্তির প্রভাবে জলকণা ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা হইতে দুইটি বাষ্প বাহির হয়। পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে ঐ দুইটির একটি উদজান অপরটি অম্লজান বাষ্প। এইরূপে জল যে উদজান ও অম্লজান বাষ্পের সংযোগে তৈরী এ বিষয় বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। তোমরা বড় হইয়া যখন বিজ্ঞানের বহি পড়িবে তখন এই পরীক্ষাটি নিজের হাতে করিয়া সকল সন্দেহ দূর করিতে পারিবে।

জল আগুন নিভায় কেন ?

আগুনের উপর জল ঢালিলে আগুন কেন নিভিয়া যায় ; তাহা বুঝিবার আগে আগুন জিনিষটা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝা দরকার।

তোমরা হয়ত বলিবে "আগুনের বিষয় বুঝিবার কি আছে। কাঠ, কয়লা কিংবা তেল জ্বালিলেই আগুন পাওয়া যায় ইহাত বরাবরই দেখিতেছি ; সুতরাং ইহাতে আর নূতনত্ব কি আছে ?" আচ্ছা, জল তোমরা বরাবরই দেখিতেছ ; জলের কি গুণ জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা নিশ্চয়ই বলিবে—জলের প্রধান গুণ তৃষ্ণা দূর করা, আর তাহা ছাড়া চিনি, লবণ ইত্যাদি জিনিষকে গলান ইত্যাদি অন্যান্য গুণও আছে। কিন্তু জলের ন্যায় আগুনও ত তোমরা বরাবর দেখিতেছ। বলত আগুনের কি কি গুণ আছে, আর আগুন জ্বলিলে তাহার শিখা ওঠে কেন ? যদি বল যে যাহার ভিতর হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়—তাহাই আগুন, তবে আগুনের গুণের বিষয় ঠিক বলা হইবে না। কারণ গরম জল, গরম তেলের ভিতর বা গরম লোহার গায়ে হাত দিলেও ত হাত পুড়িয়া যায় কিন্তু ইহাদিগের

কোনটিকেও ত আমরা আগুন বলি না। তাহা হইলে দেখ, আগুনকে তোমরা বরাবরই—এমন কি জন্মিবার পর মূহূর্ত্ত হইতেই—দেখিয়া আসিতেছ বটে, কিন্তু ইহার সঠিক খবর বা পরিচয় জান না।

আবার দেখ,—কাঠ, কয়লা বা যাহাই জ্বাল না কেন তাহার আগুনে শুধু যে জল গরম করা বা রান্না করা যায়, তাহা নয়—সেই আগুন যেখানে জ্বলে সেই জায়গাটিকে আলোকিত করে, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহা আলো ও তাপ দেয় তাহাই আগুন। কিন্তু রৌদ্র উঠিলে আমরা আলো ও তাপ দুইটিই পাই; খুব গরম লাল লোহা অন্ধকার ঘরে রাখিলে আলো পাওয়া যায় এবং তাপও পাওয়া যায়; আবার ইলেক্‌ট্রিক বা বিজলী বাতির ভিতরের তার যখন তড়িৎ শক্তির জোরে লাল হইয়া উঠে তখন আমরা আলো পাই এবং তাপও পাই—অথচ দেখ ইহাদের কোনটিকেই আমরা আগুন বলি না।

যখন কয়লা বা কাঠ জ্বলে অথবা হ্যারিকেন লণ্ঠন বা মোমবাতির পলিতা জ্বলিতে থাকে তখন তাহাদিগকে আমরা আগুন বলি। এই আগুনের শিখা থাকে। ইহারা আলো ও তাপ দেয় বটে, কিন্তু রৌদ্র, গরম লোহা বা বিজলী বাতির সহিত ইহাদের প্রভেদ কি ভাবিয়া দেখত? কাঠ জ্বালিলে ক্রমে তাহা পুড়িয়া ক্ষয় হইয়া যায়; অধিকাংশ বাষ্প হইয়া বাতাসের সহিত মিশিয়া যায় এবং যাহা বাকি

থাকে তাহাকে আমরা কয়লা বলি। ভাল করিয়া পুড়িলে কয়লাও থাকে না, ছাই থাকে। এই কয়লা কার্ব্বণ (Carbon) নামক একটা জিনিষে তৈরী। কার্ব্বণ ইংরাজী কথা—আমরা ভাল কথায় ইহাকে অঙ্গার বলি। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে তোমাদের লিখিবার পেন্‌সিলের শিশ ও বহুমূল্য হীরকের ভিতরেও কার্ব্বণ বা অঙ্গার ছাড়া আর কিছুই নাই। কাঠ, পাথর কয়লা, নানাবিধ তেল প্রভৃতি যাহাদিগকে জ্বালাইয়া আগুন পাই তাহাদিগকে ভাল কথায় দাহ্য পদার্থ বলে। এই সব দাহ্য পদার্থের প্রত্যেকেরই ভিতর অঙ্গার থাকে, আর উদজান (যাহাকে ইংরাজীতে হাইড্রোজেন (Hydrogen) বলে) নামক গ্যাস বা বাষ্প থাকে। দাহ্য পদার্থের ভিতর ইহাদের অস্তিত্ব সহজেই প্রমান করা যায়।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতির শিখার উপরে শুষ্ক কাচের গেলাস উপুড় করিয়া ধরিলে কিছুক্ষণ পরে গেলাসের গা দিয়া জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়ে। তোমরা পূর্ব্বেই জানিয়াছ যে জল উদজান ও অম্লজান বাষ্পের সংযোগে তৈরী। বাতাসের ভিতর অম্লজান আছে কিন্তু উদজান নাই। মোমবাতি জ্বলিবার সময় উহার ভিতরের উদজান বাষ্প বাহির হয় এবং উহার সহিত বাতাসের অম্লজান মিশিয়া তবে গেলাসের উপরে যে জল জমিয়াছে ঐ জল তৈরী হইয়াছে। সকল দাহ্য

পদার্থ জ্বলিবার সময় তাহাদের ভিতর হইতে উদজান বাষ্প বাহির হয়।

এইবার আর একটি পরীক্ষা করিয়া দেখ। একখানি চায়ের ডিসের উপর একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখ ও ডিসের উপর খানিকটা জল ঢাল। এইবার পূর্ব্ব পরীক্ষার মত একটি কাচের গেলাস বাতির শিখার উপর উপুড় করিয়া আস্তে আস্তে ডিসের উপর রাখিয়া দাও। একটু পরেই দেখিবে যে বাতিটি নিভিয়া আসিতেছে। একেবারে নিভিয়া যাইবার পূর্ব্বেই গেলাসটি খানিকটা উঠাইয়া লইলে দেখিবে যে বাতিটি আবার ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। পুনরায় গেলাসটি উপুড় করিয়া রাখিয়া দাও। আবার দেখিবে যে বাতিটি আস্তে আস্তে নিভিয়া গেল।

বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ গেলাসের ভিতর জল ছাড়া একটি বাষ্প থাকে। ঐ বাষ্পের নাম অঙ্গারক বাষ্প। গেলাসটি উঠাইয়া লইয়া উহার ভিতর খুব পরিষ্কার চূণের জল একটু দিয়া নাড়িলে দেখিবে যে জলটি ঘোলা হইয়া যাইবে। ভিতরের বাষ্পটিই চূণের জলকে ঘোলা করিয়া দিয়াছে। বাতি জ্বলিবার সময় উহার ভিতরে যে অঙ্গার থাকে তাহা বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প তৈরী হয়। কাঠ, কয়লা, তেল ইত্যাদি অন্যান্য দাহ্য পদার্থ জ্বলিবার সময়েই এইরূপ অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প পাওয়া যায়। অঙ্গারক

বাষ্পকে বাতাসের মত চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং জল যখন বাষ্পাকারে থাকে তখন তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং যদিও আমরা সাধারণতঃ বলি যে কাঠখানি পুড়িয়া বা মোমবাতিটি জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া গেল কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে উহাদের **কিছুই নষ্ট বা ধ্বংস হয় নাই**। অবশ্য কাঠখানি ক্ষয় হইয়া আর কাঠ রহিল না বা মোমবাতিটি ক্ষয় হইয়া আর মোমবাতি রহিল না, কিন্তু উহাদের ভিতর অঙ্গার, উদজান ইত্যাদি আসল যে সব উপাদান যতটা ছিল সবটাই আছে, কেবল অন্য আকারে বাতাসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।

এইবার দ্বিতীয় পরীক্ষার একটি প্রধান বিষয় লক্ষ্য কর। গেলাসটি জ্বলন্ত বাতির উপরে উপুড় করিয়া রাখিবার একটু পরেই বাতিটি নিভিয়া গেল—ইহার কারণ কি? নিশ্চয়ই এমন কোন জিনিষের অভাব হইয়াছে যাহার জন্য বাতিটি আর জ্বলিতে পারিল না। এই জিনিষটির নাম অম্লজান বাষ্প। অম্লজান বাষ্প না পাইলে কোন জিনিষ জ্বলিতে বা পুড়িতে পারে না। লণ্ঠনের বা মোমবাতির আলোই জ্বলুক অথবা কাঠ বা কয়লাই পুড়ুক সব ক্ষেত্রেই বাতাস হইতে অম্লজান লইয়া তবে ইহারা জ্বলে বা পোড়ে, অর্থাৎ এক কথায় জ্বলা বা **পোড়ার অর্থ দাহ্য পদার্থের সহিত অম্লজানের** মিলন **ছাড়া আর কিছুই** নয়। এই মিলনের অভাব হইলেই দহন বা পোড়া তখনই বন্ধ হইয়া যায়।

মোমবাতিটিকে গেলাস দিয়া ঢাকিয়া ফেলার পর গেলাসের ভিতরে আবদ্ধ বাতাসের মধ্যে যতটা অম্লজান ছিল তাহা বাতির অঙ্গার ও উদজানের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প তৈরী হইয়া শীঘ্র খরচ হইয়া গেল। সেজন্য অম্লজানের অভাব হওয়াতেই বাতি নিভিয়া গেল। বাতিটি সম্পূর্ণ নিভিয়া যাইবার পূর্ব্বে গেলাসটি উঁচু করিয়া উঠাইয়া লইলে বাহিরের বাতাস ঢুকিয়া অম্লজান দেওয়ায় বাতি পুনরায় জ্বলিতে থাকিবে। সুতরাং কাঠ, কয়লা বা তেল যাহা কিছু পোড়াও তাহার জন্য অম্লজান চাই—অর্থাৎ বাতাস চাই। সেজন্য লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে তোমাদের বাড়ীর রান্নাঘরে যে কয়লার বা কাঠের উনান আছে তাহার নীচে নিশ্চয়ই বাতাস ঢুকিবার রাস্তা আছে। হারিকেন লণ্ঠনের কাচের ডোমের নীচে যে চাকতি থাকে তাহার নীচে বাতাস যাইবার জন্য অনেক ছিদ্র থাকে।

আগুন জ্বালাইবার জন্য যেমন অম্লজান দরকার আমাদের শরীর রক্ষার জন্যও তেমনি সর্ব্বদাই অম্লজান দরকার হয়। আমাদের দেহে যে উত্তাপ আছে তাহা থার্ম্মোমিটার দিলেই জানিতে পারা যায়। দেহের এই উত্তাপ ও শক্তির জন্য আমরা হাঁটিয়া চলিয়া কাজ-কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতে পারি, এবং তাহারও মূল অম্লজান বাষ্প। আমরা ঘি, চিনি, ভাত, রুটি ইত্যাদি যে সকল জিনিষ খাই উহাদের প্রত্যেকটির ভিতর অঙ্গার ও উদজান আছে। আমরা সর্ব্বদা যে নিঃশ্বাস

লই উহাতে বাতাসের সহিত অম্লজান বাষ্প দেহের ভিতরে পাঠাই। তখন শরীরের ভিতর খাদ্যের অঙ্গার ও উদজানের সহিত ঐ অম্লজানের মিলন বা দহন কার্য্য চলে, এবং উহা হইতেই আমাদের শরীরের তাপ সৃষ্টি হয়। এই দহন কার্য্য দ্বারা যে বিষাক্ত অঙ্গারক বাষ্প তৈরী হয় উহা আমাদের নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় বাহিরে চলিয়া আসে। এই জন্য সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া দেহের অম্লজানের সরবরাহ করা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খুব দরকার।

এখন বোধ হয় বুঝিয়াছ যে রৌদ্র, গরম লাল লোহা বা বিজলী বাতির উজ্জ্বল তারকে কেন আমরা আগুন বলি না। ইহারা যদিও প্রত্যেকেই আলো ও তাপ দেয় তথাপি আগুনের আসল ধর্ম্ম ইহাদের নাই ; কারণ (আগুন পাইতে হইলে **দাহ্য পদার্থের সহিত অম্লজানের মিলন চাই।**) যেখানে অঙ্গার ইত্যাদির সহিত অম্লজানের মিলন নাই সেখানে আগুন নাই। তোমরা জান বোধ হয় বিজলী বাতির বাল্ব বা গোলকের ভিতর বাতাস বা অম্লজান একেবারেই নাই। অম্লজান একটু থাকিলে ভিতরের তারটি তৎক্ষণাৎ পুড়িয়া যাইবে আর আলোও বন্ধ হইবে। গরম লোহাই বল আর বিজলী বাতিই বল উহাদের তাপ ও আলো দিবার ক্ষমতা উহাদের নিজস্ব নয়। লোহা অন্য কোন আগুনের ভিতর থাকিয়া এই ক্ষমতা পাইয়াছে এবং বিজলী বাতি তড়িৎ-শক্তি হইতে এইরূপ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। লোহাটি আগুন

হইতে উঠাইয়া লইলে এবং বিজলী বাতির তড়িৎ-শক্তি বন্ধ করিলেই উহাদের আলো বা তাপ দিবার ক্ষমতাও লোপ পাইবে। সুতরাং ইহাদের কোনটিই আগুন নয়।

এইবার জল আগুন নিভায় কেন তাহা বলিব। আগুনের উপর জল ঢালিলে আগুন নিভিয়া যাইবার প্রধান কারণ এই যে কাঠ বা কয়লা যাহা জ্বলিতেছে তাহার উপর জল থাকাতে সেখানে বাতাস থাকে না ; ঐ দাহ্য পদার্থের সহিত বাতাসের অম্লজানের মিলন বন্ধ হইয়া যায়। আর অম্লজানের সহিত মিলন বন্ধ হইলেই সকল রকম আগুন নিভিয়া যায়। এইজন্যই জ্বলন্ত মোমবাতি গেলাস দিয়া ঢাকিয়া দিলে নিভিয়া যায়। আগুনের উপর জলের বদলে যথেষ্ট বালি ঢালিয়া দিলেও একই কারণে আগুন নিভিয়া যায়।

যখন কাহারও কাপড়-চোপড়ে হঠাৎ আগুন ধরিয়া যায় তখন তাড়াতাড়ি তাহার উপর মোটা কম্বল চাপা দিতে হয়। তাহা হইলে ভিতরে বাতাস যাইতে না পারায় শীঘ্রই আগুন নিভিয়া যায়।

কাঠ বা কয়লার আগুনের উপর জল ঢালিলে আগুন নিভিয়া যায় কিন্তু জ্বলন্ত তেলের উপর জল ঢালিলে উহা আগুন নিভাইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে তেল পাতলা বলিয়া তৎক্ষণাৎ জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং তখন অম্লজানের সহিত মিশিয়া স্বচ্ছন্দে জ্বলিতে থাকে।

থিয়েটার বায়স্কোপ বা কোন কোন বড় বড় আফিসে

বোধ হয় দেখিয়াছ যে সেখানে চারিদিকের দেওয়ালের গায়ে কতকগুলি ধাতুনির্ম্মিত লাল রঙের চোঙ ব্রাকেটে আট্‌কান থাকে। সেগুলিকে 'অগ্নি নির্ব্বাপক' (Fire Extinguisher) বলে। হঠাৎ যদি কোথাও আগুন লাগিয়া যায় তবে ঐগুলির দ্বারা সহজেই আগুন নিভাইতে পারা যায়। উহাদের ভিতর অঙ্গারক বাষ্প খুব জোরে ভরা থাকে। আগুনের উপর উহাদিগকে খুলিয়া দিলে অঙ্গারক বাষ্প জোরে বাহির হইয়া আগুনকে ছাইয়া ফেলে এবং তখন অম্লজানের সহিত মিশিতে না পারিয়া আগুন নিভিয়া যায়।

আগুনের শিখা ও ধোঁয়া।

পূর্ব্বেই তোমাদের বলিয়াছি যে সকল দাহ্য পদার্থ —অর্থাৎ কাঠ, কয়লা, তেল ইত্যাদি যে সকল পদার্থ পুড়াইয়া আগুন পাওয়া যায় তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের ভিতর উদজান বাষ্প ও অঙ্গার আছে। আর ইহাও বলিয়াছি যে ইহাদের জ্বলা বা পোড়ার অর্থ অম্লজানের সহিত সংযোগ। যখন কাঠ জ্বলে তখন উহার কতক উদজান বাষ্প ও অঙ্গার বাহির হয়, এবং তাহারা উপরের

দিকে উঠিবার সময় বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিতে থাকে। উদজান অপেক্ষা অঙ্গারই অম্লজানের সহিত সহজে মিশিতে পারে এবং তাহাতে অঙ্গারক বাষ্প তৈরী হয়। কাঠ যদি সম্পূর্ণ পুড়িয়া না যায় তবে যাহা বাকি থাকে তাহাকে আমরা কয়লা বলি। কাঠ-কয়লার প্রায় সবটাই অঙ্গার। গাছপালার দেহের ভিতর যেরূপ অঙ্গার আছে সেইরূপ মানুষ গরু এবং অন্যান্য জীব জন্তুর দেহের ভিতরেও অঙ্গার আছে। সেজন্য গাছপালা পুড়িলে যেমন কয়লা পাওয়া যায়, জীবজন্তুর দেহ পুড়াইলেও সেইরূপ কয়লা পাওয়া যায়; তবে জন্তুর দেহ হইতে যে কয়লা পাওয়া যায় তাহাতে অঙ্গারের পরিমাণ খুবই কম। চিনির ভিতরেও অঙ্গার আছে, সেজন্য চিনি পুড়িলে বিশুদ্ধ অঙ্গার পাওয়া যায়। কাঠের আগুনের শিখার ভিতর যে সব জিনিষ থাকে হারিকেন লণ্ঠন বা মোমবাতি জ্বালাইলেও উহাদের শিখায় একই জিনিষ থাকে। আজকাল মোমবাতি যে গাঢ় ও সাদা জিনিষ দিয়া তৈরী হয় তাহাকে 'প্যারাফিন' বলে। প্যারাফিনকে কেরোসিন তেলের জাতভাই বলা যাইতে পারে। তোমরা বোধ হয় জান যে কেরোসিন তেল মাটির নীচের খনি হইতে পাওয়া যায়। তাই বলিয়া ভাবিও না যে খনির মধ্যে এইরূপ পরিষ্কার তেল জমিয়া থাকে, এবং তাই টিন ভরিয়া চালান দেওয়া হয়। খনির ভিতর পেট্রোলিয়ম নামে এক রকম আধ পাতলা তৈলাক্ত

জিনিষ পাওয়া যায়। উহাকে চোলাই করিয়া তবে কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি তেল ও ভ্যাসেলীন ও প্যারাফিন ইত্যাদি অন্যান্য জিনিষ পাওয়া যায়।

মোমবাতির পলিতাটি জ্বালাইয়া দিলে উহার উত্তাপে প্যারাফিন গলিয়া যায়। ঐ গলা প্যারাফিন পলিতার ভিতর দিয়া উপরে উঠে এবং সেখানে অধিক উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া জ্বলিতে থাকে। হারিকেন লণ্ঠনেও কেরোসীন তেল ঐরূপে নীচে হইতে পলিতার উপরে উঠিয়া সেখানে বাষ্প হইয়া জ্বলিতে থাকে।

দাহ্য পদার্থ জ্বলিবার সময় উহার যে শিখা হয় ঐ শিখার ভিতর জ্বলন্ত উদজান ও অন্য বাষ্পও থাকে এবং অনেক ছোট ছোট অঙ্গার কণা থাকে,—যেগুলি অম্লজানের সহিত মিশিয়া সম্পূর্ণ পুড়িতে পারে নাই। এই জ্বলন্ত বাষ্প ও তাহার ভিতরের উজ্জ্বল অঙ্গার কণাগুলি লইয়াই আগুনের শিখা, এবং ঐ উজ্জ্বল কণাগুলির জন্যই আগুনের শিখা অনেকটা হল্‌দে দেখায়।

তোমরা জান যে আগুনের শিখার উপর ঘটি বাটি বা অন্য কোন ঠাণ্ডা জিনিস ধরিলেই উহাদের তলা কাল হইয়া যায়। এই কালি শিখার ভিতরকার অদগ্ধ অঙ্গার কণাগুলি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাঠ বা কয়লার উনানে রাঁধিবার সময় ভাতের হাঁড়ি বা লণ্ঠনের শিখার উপর এইরূপ কোন জিনিষ ধরিলে যে কালি পড়ে তাহাকে

আমরা ভূষা বলি। ভূষা অদগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ অঙ্গার কণা মাত্র।

আগুনের শিখার উপর হইতে যে অসংখ্য অদগ্ধ অঙ্গার বা কয়লার টুক্‌রা ভাসিয়া ওঠে তাহাকেই আমরা ধোঁয়া বলি। ধোঁয়ার ভিতর কয়লার কণার পরিমাণ যত অধিক হইবে উহার রং তত কাল হইবে। কোন জিনিষ পুড়িবার সময় তাহার ধোঁয়া যত কাল হইবে বুঝিতে হইবে সেখানে অম্লজানের যোগান তত কম হইতেছে। পুড়িবার সময় যথেষ্ট অম্লজান পাইলে উহাতে অদগ্ধ অঙ্গারের ভাগ কম থাকে সেজন্য উহার ধোঁয়া কম হয়। রেলের ইঞ্জিনের চিমনীর ভিতর হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয় তাহার রং খুব কাল, কারণ সেখানে অদগ্ধ অঙ্গারের পরিমাণ খুব বেশী। উহার ভিতর অনেক অপেক্ষাকৃত বড় বড় কয়লার টুকরাও থাকে যাহা রেল চলিবার সময় অনেক সময় আমাদের কাপড় চোপড়ে বা মাথার চুলের ভিতর আট্‌কাইয়া যায়। কাঁচা কাঠ জ্বালাইলে বেশী ধোঁয়া হয় কারণ কাঠের ভিতর জলীয় অংশ অধিক থাকায় উপরের উত্তাপ কম হয়; সেজন্য অঙ্গারের কণাগুলি ভাল করিয়া পুড়িতে পারে না, কাজেই ধোঁয়া বেশী হয়।

হারিকেন্ লণ্ঠন জ্বালাইবার সময় বোধ হয় দেখিয়াছ যে আগুনের শিখাকে কাচের চিমনী দিয়া ঢাকিবার পূর্ব্বে খুব কালো ধোঁয়া বাহির হইতে থাকে, কিন্তু চিমনী দিয়া

ঢাকিবার পর ধোঁয়া আর প্রায় থাকে না এবং তখন শিখাটি সুন্দর জ্বলে ও ভাল আলো হয়। ইহার কারণ এই যে তেল জ্বলিবার সময় উহার ভিতর হইতে যে অঙ্গার কণা সকল বাহির হয় তাহার অধিকাংশই শীঘ্রই শিখার খুব গরম অংশের বাহিরে আসিয়া পড়ে, এবং সেখানে যথেষ্ট উত্তাপ না থাকায় পুড়িতে পারে না। সেজন্য কাল ধোঁয়া বাহির হয় এবং আলোও ভাল হয় না। উপরে চিমনী দিলে শিখার ভিতরে যে বাষ্প জ্বলে তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া না গিয়া চিমনীর ভিতর আবদ্ধ থাকে এবং উহা যথেষ্ট গরম হইলে হালকা হইয়া উপরের দিকে ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর নীচের দিক হইতে যথেষ্ট নূতন বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। ঐ বাতাসের ভিতর অনেক অম্লজান থাকে সেজন্য এইবার অঙ্গার কণাগুলি চিমনীর ভিতরে যথেষ্ট উত্তাপ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অম্লজানও পায়, সুতরাং ভাল করিয়া পুড়িয়া যায়। ইহাতে ধোঁয়া কম হয় এবং আলোও ভাল হয়।

যে আগুনের শিখার রং যত হল্‌দে তাহার উত্তাপ তত কম এবং সেখানে অদগ্ধ অঙ্গার কণার পরিমাণ তত বেশী। যে শিখার রং অনেকটা নীল, তাহার উত্তাপ তত অধিক এবং সেখানে অদগ্ধ অঙ্গার কণার ভাগ তত কম। সেজন্য এইরূপ শিখার উপর জিনিস রাখিলে তাহার গায়ে কম কালি পড়ে। গ্যাসের ষ্টোভ খুব ভাল জ্বলিলে দেখিও যে তাহার শিখার রং অনেকটা নীল।

লোহার জিনিষে মরিচা ধরে কেন ?

লোহার জিনিষ কোন স্যাঁৎস্যেঁতে জায়গায় রাখিয়া দিলে উহার গায়ে মরিচা ধরে; কিন্তু উহাকে যদি আলমারীর মধ্যে বা এমন কোন জায়গায় রাখা যায় যে উহার গায়ে ভিজা বাতাস না লাগিতে পারে তবে সহজে মরিচা ধরে না। লোহার এই মরিচা জিনিষটা কি ?

পূর্ব্বে তোমাদের বলিয়াছি যে কাঠ, কয়লা ইত্যাদি দাহ্য পদার্থের দহন বা পোড়ার অর্থ অম্লজানের সহিত সংযোগ। লোহার মরিচা জিনিষটাও লোহার সহিত বাতাসের ভিতর যে অম্লজানে বাষ্প আছে তাহার সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুতরাং মরিচা ধরাকে লোহার দহন বা পোড়া বলা যাইতে পারে। কাঠ পুড়িলে যেমন উহা ক্ষয় হইয়া যায়, লোহাও এইরূপে পুড়িয়া ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। তফাৎ এই যে কাঠ খুব শীঘ্র শীঘ্র পোড়ে কিন্তু লোহা এইরূপে পুড়িতে অনেক দেরী লাগে।

লোহার উপর যে মরিচা জমে উহাতে লোহা ছাড়া যে বাহিরের আরও একটা জিনিষ অর্থাৎ অম্লজান থাকে তাহা লোহাকে মরিচা ধরার পূর্ব্বে ও পরে খুব ভাল করিয়া

ওজন করিলেই বুঝা যায়। শেষের ওজন একটু বেশী হয়। তোমরা ইচ্ছা করিলে নীচের পরীক্ষাটি করিয়া দেখিতে পার।

নীচের চিত্রের মত একটি বোতল ও একটি জল-পাত্র লও। কতকটা লোহার গুঁড়া, একটি খুব পাতলা কাপড়ে বাঁধিয়া ঐ ছোট পুঁটলিটি জলে ভিজাইয়া একটি কাচের নলের মাথায় আটকাইয়া দাও। বড় পাত্রের ভিতর খানিকটা জল রাখিয়া বোতলটি উপুড় করিয়া রাখ ও উহার ভিতর, চিত্রে যেরূপ আছে ঐরূপ ভাবে, কাচের নলটি রাখিয়া দাও। দুই তিন দিন পরে দেখিবে যে লোহার গুঁড়ায় মরিচা ধরিয়াছে ও পাত্র হইতে কিছু জল বোতলের ভিতর ঠেলিয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ এই যে বোতলের ভিতর যতটা বাতাস ছিল তাহার কিছু অংশ লোহার সহিত মিশিয়া নষ্ট হইয়াছে। সেজন্য বাতাসের খানিকটা অংশ কমিয়া গিয়াছে। নীচের জল বাতাসের সেই জায়গা দখল করাতে জল বোতলের ভিতর উঠিয়াছে। বোতলের ভিতর যে বাতাসটুকু বাকি আছে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে তাহার ভিতর অম্লজান
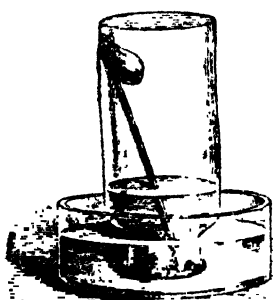
পুঁটুলির ভিতরের লোহার গুঁড়ায় মরিচা ধরিয়াছে।

নাই, উহা লোহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সেজন্য লোহার গুঁড়াকে পরীক্ষার পূর্ব্বে ওজন লইলে ও পরে একেবারে শুকাইয়া পুনরায় খুব ভাল নিক্তি দিয়া ওজন লইলে দেখা যাইবে যে পরের ওজন একটু বেশী।

তোমরা জান যে লোহার জিনিষের গা ভিজা থাকিলে উহাতে শীঘ্র মরিচা ধরে, কিন্তু উহার গায়ে জল না থাকিলে এবং উহাকে খুব শুষ্ক জায়গায় রাখিলে সহজে মরিচা ধরে না। ইহার কারণ লোহা সহজে অম্লজানের সহিত মিশিতে পারে না কিন্তু জল ও বাতাস এক সঙ্গে ইহার গায়ে লাগিলে তখন ইহা বাতাসের অম্লজানের সহিত সহজেই মিশিয়া যায়।

বাতাসের ভিতর সকল সময়েই অল্পবিস্তর জলীয় বাষ্প মিশানো থাকে। বর্ষার দিনে বা জলা জায়গায় বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশী থাকে ; সেজন্য ঐ ভিজা বাতাস লোহার জিনিষের গায়ে লাগিলে উহাতে সহজেই মরিচা ধরে ; কিন্তু লোহাকে একেবারে জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখিলে অথবা বাক্স বা আলমারীর ভিতর রাখিলে উহার গায়ে বাতাস লাগিতে পারে না বলিয়া সহজে মরিচা ধরে না। সাধারণতঃ যাহাতে গায়ে বাতাস না লাগে সেজন্য তেল, ভ্যাসিলীন ইত্যাদি লাগাইয়া লোহার জিনিষের মরিচা ধরা বন্ধ করা হয়। তোমরা দেখিয়াছ যে লোহার ফটক ইত্যাদির গায়ে তেল মিশানো রং লাগাইয়া উহাকে মরিচা ধরা হইতে রক্ষা

করা হয়। টিন, দস্তা, নিকেল ইত্যাদি কয়েকটি সস্তা ধাতু আছে যাহাতে সহজে মরিচা ধরে না—অর্থাৎ বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশে না। সেজন্য অনেক লোহার জিনিষের উপর টিন বা নিকেলে পাতলা লেপ বা আবরণ দেওয়া থাকে। কেরোসীন তেলের টিনগুলি সত্য সত্য টিন্ দিয়া তৈরী নয়। উহা পাতলা লোহার পাত দিয়া তৈরী। ঐ লোহার উপরে টিনের আবরণ দেওয়া থাকে মাত্র, যাহাতে মরিচা ধরিয়া নষ্ট না হয়। যখন টিনের আবরণটি নষ্ট হইয়া যায় তখন মরিচা ধরিতে আরম্ভ করে, সেজন্য পুরাতন হইলে টিনে মরিচা ধরে তাহা দেখিয়াছ। কোন কোন লোহার পাতে দস্তার লেপ দেওয়া হয় যেগুলিকে গ্যাল্ভানাইজড্ লোহা বলে। যে সব লোহার পাত দিয়া বালতি তৈরী হয় সেগুলি ঐরূপ দস্তামোড়া।

তামা, সীসা, কাঁসা, পিতল প্রভৃতি সাধারণ ধাতুগুলির সহিতও অম্লজান মিশে, সেজন্য এই সকল ধাতু নির্ম্মিত জিনিষগুলি যতই চক্‌চকে করিয়া রাখ, বাতাস লাগিলে উহাদের উপর একটি পাতলা আবরণ পড়িয়া উপরিভাগ মলিন হইয়া যায় ; কিন্তু ইহাদের সহিত লোহার জিনিষের তফাৎ এই যে মরিচা লোহাকে যেমন ক্ষয় করিয়া বা খাইয়া ফেলে অন্য সব ধাতুকে সেরূপ নষ্ট করে না। তাহাদের উপরের ময়লা আবরণটি সহজেই উঠিয়া যায়। যাহাতে তামা, পিতল ইত্যাদির জিনিষে এরূপ মলিন আবরণ না

পড়ে সেজন্য উহাদের উপরেও তাড়িৎ-শক্তির সাহায্যে নিকেলের বা রূপার পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়। তোমরা চা খাইবার সময় যে চামচ ব্যবহার কর উহার উপরের সাদা রংটি নিকেলের জিনিষটা আসলে কিন্তু পিতল দিয়া তৈরী। এইরূপ পিতলের গেলাস, ডিস, কাঁটা, ছুরী ইত্যাদি অনেক জিনিষে নিকেলের আবরণ দেওয়া থাকে; একটু বেশী দামের জিনিষগুলিতে রূপার আবরণও থাকে। অল্প দামের চামচগুলি কিছুদিন ব্যবহার করিবার পরেই ভিতরের পিতল বাহির হইয়া পড়ে।

বিশুদ্ধ সোনা ও রূপার সহিত অম্লজান মিশিতে পারে না বলিয়া সোনা-রূপার জিনিষ বাতাসে ময়লা করিতে পারে না। কিন্তু বাতাসে ময়লা না হইলেও রূপার জিনিষ গন্ধক ইত্যাদি অন্য দুই একটি জিনিষের সংস্পর্শে আসিলেই ময়লা হইয়া যায়; সেজন্য চক্‌চকে রূপার চামচ করিয়া ডিম খাইলে উহা ময়লা হইয়া যায়, কারণ ডিমের ভিতর গন্ধক থাকে। কয়লা জ্বালাইলে যে গ্যাস হয়, তাহাতেও গন্ধক থাকে, রবারের ভিতরও গন্ধক থাকে; সেজন্য ইহারা গায়ে লাগিলেও রূপার জিনিস ময়লা হইয়া যায়।

গরম করিলে সকল জিনিষের আয়তন বাড়ে কেন ?

তোমরা জান যে জল বা দুধকে গরম করিলে উহাদের আয়তন বাড়ে, সেজন্য উহাদিগকে যে পাত্রে রাখা যায় গরম করিলে উহারা সেই পাত্রের উপরের দিকে ঠেলিয়া ওঠে। জ্বর হইলে দেহের উষ্ণতা পরীক্ষার জন্য ডাক্তারবাবু বগলে থার্মোমিটার দেন তাহা নিশ্চয় জান। থার্মোমিটারের ভিতর খানিকটা পারা ভরা থাকে। বগলে দিলে দেহের উত্তাপ দ্বারা থার্মোমিটারের পারা গরম হইয়া ওঠে এবং তখন ঐ পারার আয়তন বাড়িয়া যাওয়ায় উহা উপরের দিকে ঠেলিয়া ওঠে। নলের ভিতর কতদূর উঠিয়াছে তাহা দেখিয়া দেহের উষ্ণতার মাত্রা বুঝা যায়। শুধু যে জল, দুধ বা পারার আয়তন বাড়ে তাহা নয়, হাওয়া গরম হইলে তাহার আয়তন আরও বেশী বাড়ে; এবং লোহার মত শক্ত জিনিষকে গরম করিলে তাহাও লম্বা-চওড়া চারিদিকে বাড়ে;—অর্থাৎ লোহা বা তামার মত কঠিন, জল বা দুধের মত তরল এবং বাতাস বা অন্যান্য গ্যাস ইত্যাদির ন্যায় বায়বীয় যত রকম জিনিষ আছে গরম করিলে সকলেরই

আয়তন বাড়ে। আবার এই সমস্ত জিনিষকে ঠাণ্ডা করিলে উহাদের আয়তন কমে। গরম করিলে আয়তন বাড়ে না বরং কমিয়া যায়, এমন জিনিষ কি আছে বল দেখি? এরূপ মাত্র একটি জিনিস আছে—সেটি রবার।

এই বাড়া-কমার কারণটির বিষয় তোমাদের বলিব। তোমরা বোধ হয় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নাম শুনিয়াছ এবং কেহ কেহ হয়ত দেখিয়াছ। এই যন্ত্র দ্বারা খুব ছোট জিনিষকে খুব বড় দেখায়। বইয়ের পাতার কাগজখানি তোমার কত পালিশ ও সমান মনে হইতেছে কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে ইহা একেবারেই সমান না, কত উঁচু নীচু আছে। একটি চিনির ঢেলা লইয়া শুধু চোখে দেখিবে যে চিনির দানাগুলি ভিতর কোন ফাঁক নাই; উহারা সব গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে চিনির দানাগুলির মধ্যে অনেক ফাক আছে। একখানি লোহার পাত, শুধু চোখে যাহা সমান মনে হইবে, ঐ যন্ত্র দিয়া দেখিলে তাহাকে কত উঁচু নীচু দেখা যাইবে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি যত ভাল হইবে উহা দ্বারা ছোট জিনিষ তত বেশী বড় দেখা যাইবে। যদি এমন একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র পাওয়া যায় যাহা দ্বারা একটি ধূলিকণাকে হিমালয় পাহাড়ের মত বড় দেখা যায় তবে সেই যন্ত্র দিয়া লোহার পাতটিকে দেখিলে দেখিবে লোহাটি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বা অণুর দ্বারা

তৈরী এবং চিনির ঢেলার দানাগুলির ভিতর যেমন ফাঁক আছে, লোহার অণুগুলির ভিতরও সেইরূপ কম বেশী ফাঁক রহিয়াছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য জিনিস দেখিবে যে ঐ অণুগুলির একটিও স্থির নাই। সবগুলিই পরস্পরকে টানাটানি, এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি ও ধাক্কাধাক্কি করিতেছে। শুধু যে লোহার ভিতর এরূপ দেখিতে পাইবে তাহা নয়। সোণা, তামা, ইট, কাঠ, জল, মাটি সকল জিনিসের ভিতর ঐরূপ ছুটাছুটি ধাক্কাধাক্কি ব্যাপার দেখিতে পাইবে। দেখিবে যে কোনটির অণুগুলি ছোট, কোনটির একটু বড়; কোনটির অণুগুলির মধ্যে বেশী ফাঁক, কোনটির মধ্যে একটু কম, কোনটির অণুগুলি বেশী জোরে ছুটাছুটি করিতেছে এবং কোনটিতে জোর হয়ত কিছু কম।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে ঐরূপ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা এখনও সম্ভব হয় নাই, সেজন্য জিনিষ পত্রের অণুগুলির ছুটাছুটি সত্য সত্য চোখ দিয়া দেখিবার উপায় এখনও বাহির হয় নাই। তাহা না হইলেও বৈজ্ঞানিকেরা এমন সব সুন্দর সুন্দর পরীক্ষা করিয়াছেন যাহাতে উহাদের অস্তিত্ব ও ছুটাছুটির কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারা নানা পরীক্ষা দ্বারা নিঃসন্দেহ হইয়া বলিয়াছেন যে কঠিন, তরল ও বায়বায় সকল জিনিষই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সংযোগে তৈরী এবং ঐ অণুগুলি সর্ব্বদাই ছুটাছুটি করিতেছে। তাঁহারা ইহাও দেখিয়াছেন যে, কোন

জিনিষকে গরম করিলে উহার অণুগুলির ছুটাছুটির বেগ বাড়িয়া যায় এবং তখন উহারা আরও ফাঁক হইয়া যায়। জলকে গরম করিলে উহার অণুগুলি আরও ফাঁক হইয়া যায় বলিয়া উহার আয়তন বাড়ে এবং খুব বেশী গরম করিলে যখন অণুগুলির টানাটানির বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় তখন উহারা বাতাসের ভিতর চারিদিকে ছড়াইয়া যায়—অর্থাৎ বাষ্প হইয়া যায়। একখণ্ড লোহাকে গরম করিলে তাহার অণুগুলির ছুটাছুটির জোর বাড়িয়া যায় এবং তাহারা আরও বেশী ফাঁক ফাঁক হইয়া যায় এবং সেজন্য লোহাটির আয়তনও বাড়িয়া যায়। কিন্তু শুধু এই কথা বলিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা ক্ষান্ত হন নাই। জলে কি পরিমাণ উত্তাপ দিলে তাহা বাষ্পে পরিণত হয়, লোহাখানিকে কত উত্তাপ দিলে উহা কত বাড়িবে, এবং লোহা, জল প্রভৃতি কোন জিনিষের অণুগুলি কত জোরে ছুটাছুটি করে ইত্যাদি বিষয়ও তাঁহারা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন।

তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের কথায় বলিতে হইবে যে কোন জিনিষকে **গরম করার অর্থ তাহার অণুগুলির ছুটাছুটির বেগ আরও বাড়ান।** আগুনের উপর কোন জিনিষ রাখিলে তাহার উত্তাপ বাড়ে, কারণ আগুনের ঐ জিনিষের অণুগুলির ছুটাছুটির বেগ বাড়াইয়া দেয়। আবার আগুন হইতে কিছুদূরে অথবা রৌদ্রে জিনিষপত্র রাখিলে তাহাও গরম হয় এবং আমরা দাঁড়াইলেও আমাদের দেহ গরম

হয়। যদিও এখানে আগুনের বা সূর্য্যের উত্তাপ সোজা-সুজি জিনিষ পত্রের বা আমাদের গায়ে লাগে না, তথাপি উহাদের উত্তাপ কিরূপে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়া আসিয়া জিনিষ পত্র গরম করিয়া দেয় তাহা বলিতেছি।

ইথারের কথা তোমরা বোধ হয় জান না। বাতাস যেমন দেখা যায় না, এই ইথারও তেমনি কেহই দেখিতে পায় না। বাতাস সকল জায়গায় নাই কিন্তু **ইথার** * সর্ব্বত্র আছে—জিনিষ পত্রের ভিতরেও আছে। এই ইথারই তাপ ও আলো এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া দেয়। যখনই কোথাও আলো ও আগুন জ্বলে উহারা সেখানকার ইথারের কণাগুলিকে কাঁপাইয়া ঢেউ সৃষ্টি করে। এই ছোট বড় ঢেউগুলি চারিদিকে ছুটিয়া চলে। আলো, তাপ, তড়িৎ ইত্যাদি সবগুলিরই মূল ইথারের ঢেউ। আলোর ঢেউগুলি একটু ছোট ও আগুনের বা তাপের ঢেউগুলি আলোর ঢেউয়ের চেয়ে বড়। সূর্য্য উঠিলেই এরূপ অসংখ্য ঢেউ ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কাছে পৌঁছায়। আলোর ছোট ঢেউগুলি আমাদের চোখে পড়িলে আমরা দেখিতে পাই। আর একটু বড় ঢেউগুলি জিনিষ পত্রের উপর বা আমাদের দেহের উপর পড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া অণুগুলির ছুটাছুটির জোর বাড়াইয়া দেয় এবং তাহাতেই উত্তাপ

* ইথারের কথা ভাল করিয়া জানিতে হইলে লেখক প্রণীত "বিজ্ঞানের খবর" পড়

বাড়ে। সুতরাং জিনিষের অণুগুলির ছুটাছুটির বেগ বাড়ানর অর্থই তাপ সৃষ্টি করা এবং উহার জন্য অণুগুলি ফাঁক ফাঁক হইলেই জিনিষটির আয়তন বাড়ে। আবার অণুগুলি ফাঁক ফাঁক হইলে উহাদের নিজেদের ভিতর টানাটানির জোর পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। এইজন্য লোহার মত কঠিন জিনিষও আগুনে নরম হইয়া যায়, এবং বরফ, মাখন ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ আগুনের কাছে রাখিলে অতি সহজেই তরল অবস্থায় পরিণত হয়।

আগুন ছাড়াও যে কোন রকমে জিনিষপত্রের উত্তাপ বাড়িলেই উহারা লম্বা-চওড়ায় চারিদিকেই বাড়িয়া যায়। এমন যে শক্ত লোহা, তাহাও শুধু ঘর্ষণের দ্বারা যে তাপ সৃষ্টি হয় তাহার জন্য উহার লম্বা চওড়া বাড়িয়া যায়। যেখানে রেল লাইন পাতা আছে সেখানে লক্ষ্য করিয়া দেখিও যে প্রত্যেক দুখানি লোহার রেলের ভিতর একটু করিয়া ফাঁক রাখা হয়। ইহার কারণ যখন লাইনের উপর দিয়া গাড়ী যায় তখন তাহার চাকার সহিত ঘর্ষণের ফলে লোহার রেলগুলি গরম হইয়া লম্বায় বাড়িয়া যায়। সেই বাড়ার জায়গা দিবার জন্য দুইটি রেলের ভিতর ফাঁক রাখিতে হয়। নতুবা মুখে মুখে লাগিয়া জোর করিয়া লাইন উপরে উঠিয়া রেলপথ নষ্ট হইয়া যাইত। যদি এতদিন পর্য্যন্ত ইহা না দেখিয়া থাক তবে এইবার সুবিধা হইলে ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিও।

গরম জলে কাচের গেলাস ফাটিয়া যায় কেন?

তোমরা দেখিয়াছ যে চা তৈরী করিবার সময় গরম জল এ্যালুমিনিয়ম বা তামার চা-দানির ভিতর রাখিলে উহার হাতল এত বেশী গরম হইয়া যায় যে তাহা হাত দিয়া ধরিতে পারা যায় না; কিন্তু একই রকম গরম জল চীনামাটির চা-দানির ভিতর রাখিলে উহার হাতল তত গরম হয় না বলিয়া অনায়াসে ধরিতে পারা যায়। ইহার কারণ এ্যালু-মিনিয়ম বা তামার ভিতর দিয়া উত্তাপ সহজেই চলাচল করিতে পারে, সেজন্য চা-দানির ভিতরের গরম জলের উত্তাপ সহজেই হাতল পর্য্যন্ত চলিয়া আসে কিন্তু চীনা-মাটির ভিতর দিয়া উত্তাপ সহজে চলাচল করিতে পারে না বলিয়া চীনামাটির চা-দানির ভিতর হইতে উত্তাপ সহজে বাহিরে আসে না; সুতরাং উহার হাতল শীঘ্র গরম হয় না। এইজন্য চায়ের কাপগুলিও সাধারণতঃ চীনামাটি দ্বারা তৈরী হয় যাহাতে গরম চা পান করিবার সময় ঠোঁটে বেশী উত্তাপ না লাগে। তামা বা এ্যালুমিনিয়মের ন্যায় সোণা, রূপা, কাঁসা, পিতল ইত্যাদি অন্য সব ধাতুর ভিতর

দিয়াও উত্তাপ সহজে চলাচল করে ; কিন্তু কাচ, কাঠ, মাটি, পাথর ইত্যাদির ভিতর অত সহজে যাতায়াত করিতে পারে না ; আবার কাগজ, কাপড়, চামড়া ইট, পশম ইত্যাদির ভিতর আরও কম যায়। এইজন্য আমরা শীতকালে পশমের জামা ব্যবহার করি ও তাহাকে গরম জামা বলি ; কিন্তু সত্য সত্যই জাকাটি গরম নয়, উহা শরীরকে গরম রাখে। পশমের জামা গায়ে দিলে উহা আমাদের শরীরের উত্তাপকে সহজে বাহিরে যাইতে বা বাহিরের ঠাণ্ডাকে ভিতরে যাইতে দেয় না। ইহাতে আমাদের শরীরের উত্তাপ নষ্ট হয় না বলিয়া শরীর গরম থাকে, এবং এইজন্য আমরা পশমের জামাকে গরম জামা বলি।

কাচের ভিতর তাপ সহজে চলাচল করিতে পারে না বলিয়াই কাচের গেলাসে গরম জল ঢালিলে গেলাস ফাটিয়া যায়। গেলাসের ভিতর গরম জল দিলে ভিতরের দিকে গরম হইয়া যায়, কিন্তু সে উত্তাপ সহজে বাহিরের দিকে আসিতে পারে না। আর তোমরা জান যে জিনিষ গরম হইলেই তাহা লম্বায় চওড়ায় বা আয়তনে বাড়িয়া যায় ; সেজন্য গেলাসের ভিতরের দিকটা গরম হইয়া যতটা বড়িয়া যায় বাহিরের দিক তত বাড়ে না। সুতরাং ভিতরে বেশী বাহিরে কম এই অসমান বাড়ার জন্য গেলাসটি ফাটিয়া যায়। গেলাসের চারিদিকের কাচ যদি খুব পাতলা থাকে তবে তাহা সহজে ফাটে না এবং প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকের

ল্যাবরেটরীতে অনেক কাচের জিনিষ জল ও অন্যান্য জিনিষ গরম করিবার জন্য ব্যবহার হয়; কিন্তু কাচ মোটা হইলে বিশেষতঃ যে সব গেলাসের উপর পাতলা ও তলা মোটা তাহারা সহজেই ফাটিয়া যায়। গরম জল দিলে ভিতরে ও বাহিরে অসমান বাড়ার জন্য যেমন ফাটে তেমনি ভিতরে বরফ দিলেও বাহিরের দিক অপেক্ষা ভিতরের দিক হঠাৎ অধিক সঙ্কুচিত হইয়া যায় বলিয়াও অনেক সময় গেলাস ফাটিয়া যায়। কাঁসা, পিতল ইত্যাদি তাপকে সহজেই চলাচল করিতে পারে বলিয়া ঐ কাঁসা, পিতল ইত্যাদি ধাতুর গেলাস বা বাটি গরমে বা ঠাণ্ডায় সহজে ফাটিয়া যায় না।

:০:—

থার্ম্মোস্ ফ্লাস্কের গুণ

আজকাল থার্ম্মোস্ ফ্লাস্ক তোমরা প্রায় সকলেই দেখিয়াছ। আর জান যে উহার ভিতর গরম চা বা গরম দুধ ইত্যাদি রাখিলে উহা শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় না; আবার বরফ জল উহার ভিতর রাখিয়া দু'এক দিন পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা রাখা যায়। বরফ বাহিরে রাখিলে শীঘ্র গলিয়া যায় কিন্তু টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া এই বোতলের ভিতর রাখিলে সহজে গলে না।

কোথাও যাতায়াত করিবার সময় থার্মোস্ ফ্লাস্ক অনেক কাজে লাগে। যাঁহাদের চা খাইবার অভ্যাস আছে, তাঁহারা হয়ত কোথাও যাইবার সময় সকালে বাড়ী হইতে চা খাইয়া বাহির হইলেন এবং কিছু গরম চা ফ্লাস্কে ভরিয়া লইলেন। বৈকালে পুনরায় চা খাইবার সময় ফ্লাস্ক খুলিয়া একেবারে তৈরী গরম চা পাইলেন, চা প্রস্তুত করিবার কোনই হাঙ্গামা করিতে হইল না। ট্রেণে যাইবার সময় থার্মোস্ ফ্লাস্কে করিয়া অনেকে ছোট ছেলেপিলের জন্য গরম দুধ ভরিয়া লন। কিন্তু ইহাতে গরম জিনিষ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গরম থাকে, আবার ঠাণ্ডা জিনিষও অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে কেন তাহা বলিতেছি।

প্রথমে বুঝিয়া দেখ যে গরম জিনিষ ক্রমে ঠাণ্ডা হয় কেন। এক বাটি গরম দুধ রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে বাতাস ঐ গরম দুধের গায়ে লাগিয়া গরম হইয়া যায়। বাতাস গরম হইলে উহা ঠাণ্ডা বাতাস অপেক্ষা হাল্কা হইয়া উপরে উঠিয়া যায় এবং তখন চারিদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে। ঐ ঠাণ্ডা বাতাসও দুধের গায়ে লাগিয়া গরম হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে দুধের তাপ নষ্ট হয় বলিয়া উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। অন্য সব গরম জিনিষও এইরূপে ঠাণ্ডা হয়। যদি এমন কোন উপায় করা যায় যাহাতে গরম জিনিষের গায়ে অন্য কোন জিনিষ না লাগে,

এমন কি উহাকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য স্থানে রাখা যায়, তবে উহার তাপ নষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং উহা ঠাণ্ডাও হয় না। যদিও সম্পূর্ণরূপে এই প্রকার ব্যবস্থা করা একরূপ অসাধ্য, তথাপি থার্ম্মোস্ ফ্লাস্ক যতদূর সম্ভব এই উপায়ে গঠিত বলিয়া উহার ভিতরে রাখা গরম জিনিষের তাপ শীঘ্র নষ্ট হয় না। গরম জিনিষ নিজের তাপ বাহিরে দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়, আর ঠাণ্ডা জিনিষ বাহির হইতে তাপ লইয়া নিজে গরম হইয়া উঠে। বরফ বাহিরের বাতাস হইতে তাপ লইয়া গলিয়া যায় এবং বরফ জলও এইরূপে ক্রমে গরম হইয়া উঠে। কিন্তু থার্ম্মোস্ ফ্লাস্কের ভিতর রাখিলে বরফ জলের গায়ে বাহিরের বাতাস লাগিতে পারে না বলিয়া উহা শীঘ্র গরম হয় না।

থার্ম্মোস্ ফ্লাস্কের ভিতরের ব্যবস্থা পরপৃষ্ঠার চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে। (ক) একটি কাচের বোতল। লক্ষ্য করিয়া দেখ যে এ বোতলটি সাধারণ বোতলের মত নয়। একটি বড় বোতলের ভিতর আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট বোতল রাখিয়া মুখ দুইটি সমানভাবে জোড়া হইয়াছে; সেজন্য দুই বোতলের ভিতরের জায়গাটা একেবারে ফাঁপা। উভয় বোতলের মধ্যে মধ্যে যে বাতাস থাকে তাহা বড় বোতলটির নীচের একটি ছিদ্রপথ (গ) দিয়া পাম্পের সাহায্যে যতদূর সম্ভব বাহির করিয়া লইয়া ঐ ছিদ্রটি শেষে কাচ গলাইয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া

হয়। যাহাতে কাচের বোতলটি সহজে ভাঙ্গিয়া না যায় সেজন্য উহাকে আর একটি বড় ধাতুনির্ম্মিত বোতলের (খ) ভিতর রাখা হয়। কাচের বোতলের ভিতর কোন গরম জিনিষ রাখিয়া উহার মুখটি ছিপি দিয়া ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে তাপ আর সহজে বাহির হইতে পারে না।
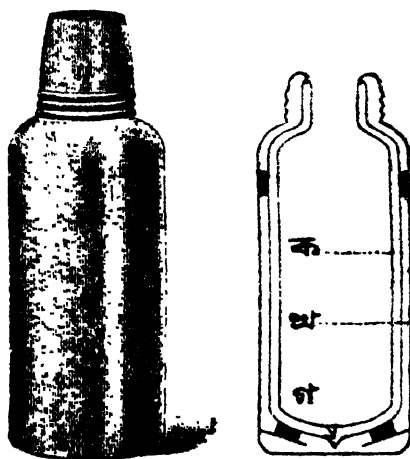
থার্ম্মোস্ ফ্লাস্ক

যাহাতে বোতলের ভিতর হইতে তাপ বাহিরে না আসিতে পারে সেজন্য আরও একটি উপায় অবলম্বন করা হয়। তোমরা জান বোধ হয় যে আমরা যে সব আয়না দিয়া মুখ দেখি তাহার পিছন দিকে কাচের উপর একটি প্রলেপ দেওয়া থাকে। শুধু কাচের ভিতর দিয়া আলোর রশ্মি এক দিক হইতে গিয়া অন্য দিকে বাহির হইয়া যায়

কিন্তু আয়নার পিছনে ঐরূপ প্রলেপ থাকার জন্য আলোর রশ্মি উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে না। আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে আলোর রশ্মি আমাদের মুখের উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া আয়নায় পড়িয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া যখন চোখের উপর পড়ে তখন আমরা মুখের চেহারা দেখিতে পাই ইহা পূর্ব্বে পড়িয়াছ। আয়নার পিছনে যেমন প্রলেপ দেওয়া থাকে থার্ম্মোস্ ফ্লাস্কে কাচের ছোট বোতলটির পিছন দিকেও ঐরূপ প্রলেপ দেওয়া থাকে। আয়নার প্রলেপ যেমন আলোর রশ্মিকে বাহিরে যাইতে না দিয়া পুনরায় সম্মুখ দিকে ঘুরাইয়া আনে, থার্ম্মোস্ ফ্লাস্কের বোতলের পিছনে প্রলেপ দেওয়াতে ভিতরের তাপ বাহিরে যাইতে না পারিয়া বোতলের ভিতরেই থাকে।

এইরূপে থার্ম্মোস্ ফ্লাস্কের দুই বোতলের ভিতরের জায়গা বায়ুশূন্য থাকাতে এবং ছোট বোতলটির পিছন দিকে আয়নার মত প্রলেপ থাকাতে ভিতর হইতে তাপ বাহিরে যাইতে পারে না এবং বাহিরের তাপও ভিতরে আসিতে পারে না।

তোমরা হয়ত বলিবে যে এত কাণ্ড করিবার পরও ইহার ভিতর হইতে উত্তাপ কিরূপে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রথম কারণ এই যে বোতলকে একেবারে বায়ুশূন্য করা অসম্ভব, ভিতরে সামান্য বাতাস থাকিয়াই যায়। তার পর বোতলের মুখ ছিপি দিয়া আঁটা থাকে সুতরাং সেখানে

বাহিরের বাতাসের সহিত সংস্পর্শ থাকে। আর বোতলের পিছনে যে আয়না তৈরী থাকে তাহাও নিখুঁত নয়। এই সমস্ত কার্য্য একেবারে নিখুঁতভাবে করা সম্ভব হইলে বোতলের ভিতরে রাখা গরম অথবা ঠাণ্ডা জিনিষ চিরকালের জন্য গরম অথবা ঠাণ্ডা থাকিয়া যাইবে।

থার্ম্মোস্ ফ্লাস্ক কতদিন আগে প্রথম তৈরী হইয়াছিল তাহা বোধ হয় জান না। ১৮৯২ সালে স্যর জেম্‌স ডিওয়ার (Dewar) নামে ইংলণ্ডের একজন রসায়ন-বিজ্ঞানবিৎ ইহা প্রথম তৈরী করেন, সেজন্য ইহাকে 'ডিওয়ার ফ্লাস্ক'ও বলে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কোন ঠাণ্ডা জিনিষকে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য ডিওয়ার ইহা প্রথম তৈরী করেন। পরে ইহা সকলেরই বিশেষ কাজে আসিয়াছে।

—:০:—

ব্লটিং কাগজ কালি শোষে কেন ?

ব্লটিং কাগজ কেন কালি বা জল শুষিয়া লয় সে কথা বুঝিবার আগে দুইটি সহজ পরীক্ষা করিয়া দেখ।
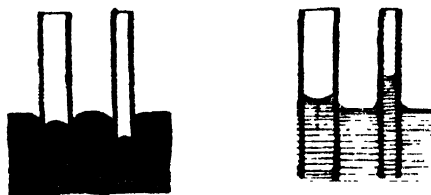
(পারা) ১নং চিত্র (জল)

ডানদিকের নলদু'টির ভিতর জল উঠিয়াছে, বাঁ দিকে পারা আছে বলিয়া উহা উপরে উঠিতে পারে নাই। আরও নীচে গিয়াছে।

১। দুই তিনটি সরু ছিদ্র বিশিষ্ট কাচ-নল জোগাড় কর। থার্ম্মোমিটারের যেরূপ সরু ছিদের ভিতর দিয়া পারা উঠা নামা করে প্রায় ঐরূপ ছিদ্র হইলে ভাল হয়। একটি বাটিতে জল রাখিয়া উহাতে একটু লাল কালি মিশাইয়া জলের রং লাল করিয়া দাও। এখন ঐ কাচ-নলগুলির একমুখ বাটির জলের মধ্যে ডুবাইয়া উহাদের পাশাপাশি সোজা করিয়া রাখ। দেখ, বাটির লাল জল ঐ নলগুলির ছিদ্র মধ্যে আপনা-আপনি কিছুদূর পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। (১নং চিত্র দেখ, ডানদিকে)। যদি নল-গুলির ছিদ্র সরু মোটা থাকে তবে জল কোনটিতে বেশী

কোনটিতে কম দূর উঠিবে। যাহার ছিদ্র যত সরু তাহার ভিতর তত অধিকদূর পর্য্যন্ত উঠিবে।

২। একটি কাচের গেলাসে খানিকটা জল লও। এখন লণ্ঠনের একটি পরিষ্কার পলিতা লইয়া উহার একদিকের খানিকটা অংশ গেলাসের জলের ভিতর ডুবাইয়া দাও যাহাতে গেলাসের তলদেশ পর্য্যন্ত যায় এবং অপর দিকে গেলাসের বাহিরে ঝুলাইয়া রাখ। (২নং চিত্র দেখ)। একটি খালি গেলাস পলিতার ঐ ঝুলান মুখের নীচে রাখিয়া দাও। দেখিবে যে গেলাসের জল পলিতার সূতার আঁশগুলির সরু ফাঁকের মধ্য দিয়া আপনা-আপনি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতেছে এবং পলিতাটিও ক্রমে ভিজিয়া উঠিতেছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলে দেখিবে যে পলিতার ঝুলান মুখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল অপর গেলাসের ভিতর পড়িতেছে। সমস্ত রাত্রি এরূপ রাখিয়া প্রাতে আসিয়া দেখিবে যে প্রথম গেলাসের সব জলই দ্বিতীয় গেলাসে চলিয়া গিয়াছে।
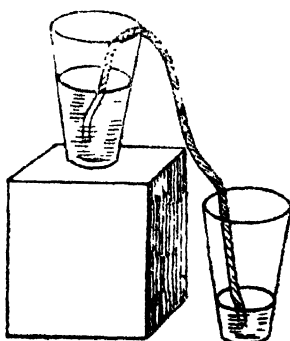
২নং চিত্র

পলিতার ভিতর দিয়া জল নামিয়া আসিতেছে।

প্রথম পরীক্ষায় কাচ-নলের ছিদ্রের ভিতর যে কারণে

জল আপনা-আপনি উঁচুতে উঠিয়াছে সেই একই কারণে এখানেও পলিতার সূতাগুলির ফাঁকের ভিতর দিয়া জল ঠেলিয়া উঠিয়া ক্রমে অপর গেলাসে গিয়া পড়িয়াছে।

ছোটবেলায় খেজুর রস খাইবার সময় গেলাসে রস রাখিয়া উহা চুমুক দিয়া না খাইয়া পাট-কাঠির নল লাগাইয়া মুখ দিয়া টানিয়া খাইতাম। তোমরাও অনেক সময় এইরূপ করিয়া থাকিবে। মুখ দিয়া নলের ভিতরকার হাওয়া আকর্ষণ করিয়া লইলে গেলাসের রস উপরে উঠিয়া যায়। পূর্ব্বের পরীক্ষা দুটিতে পলিতার ভিতর বা সরু নলের ভিতর বা ঐরূপ অন্য কোন আকর্ষণের বলে জল আপনিই উপরের দিকে ঠেলিয়া ওঠে। যে আকর্ষণের বলে সরু ছিদ্রপথ দিয়া জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ উপরে ওঠে বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নাম দিয়াছেন "কৈশিক আকর্ষণ"। কেশের ন্যায় সরু ছিদ্র পথ দিয়া এই আকর্ষণ হয় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

কৈশিক আকর্ষণের মোটামুটি দুইটি কারণ। প্রথম—তোমরা জান যে জগতের প্রত্যেক জিনিস খুব ছোট ছোট কণিকার সমষ্টি মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা এই কণিকাকে 'অণু' বলেন। জল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলের অণু দিয়া তৈরী। সেইরূপ লোহা বা কাচও লোহার অণু বা কাচের অণু দিয়া তৈরী। এই অণুগুলি সর্ব্বদাই পরস্পরকে টানাটানি করে। একই পদার্থের অণুগুলির মধ্যে টানাটানির নাম 'আশ্লেষণ'।

দ্বিতীয়—একই পদার্থের অণুগুলি যেমন পরস্পরকে টানাটানি করে তেমনি আবার এক পদার্থের অণু অপর পদার্থের অণুকেও টানাটানি করিতে পারে—যদি তাহারা পাশাপাশি থাকে। কাচের গেলাসে জল রাখিলে জলের অণু জলের অণুকে টানে, আবার জলের অণু কাচের অণুকেও টানে। সেজন্য গেলাস উপুড় করিয়া জল ফেলিয়া দিলেও জলের ও কাচের অণুর টানাটানির ফলে দু'চার ফোঁটা জল গেলাসের গায়ে আটকাইয়া থাকে। দুইটি বিভিন্ন পদার্থের অণুগুলির পরস্পর টানাটানির নাম ভাল কথায় দেওয়া হইয়াছে 'আসঞ্জন বা সংলগ্নতা'।

উপরে যে কৈশিক আকর্ষণের কথা বলিলাম উহা এই আশ্লেষণ ও আসঞ্জনের ফলে ঘটিয়া থাকে। নলের সরু ছিদ্রের ভিতর জল ঠেলিয়া ওঠা ব্যাপারটি জলের অণুর নিজেদের মধ্যে টানাটানি (অর্থাৎ আশ্লেষণ) এবং জলের অণু ও কাচের অণুগুলির টানাটানি (অর্থাৎ আসঞ্জন) এই উভয় প্রকার টানাটানির ফলে ঘটিয়া থাকে।

কৈশিক আকর্ষণের বহু দৃষ্টান্ত তোমরা সর্ব্বদাই পাইয়া থাক। ব্লটিং কাগজের জল শুষিয়া লওয়া ইহারই একটি দৃষ্টান্ত। তোমরা হয়ত জান না যে কাগজ শুধু চোখে যত পালিশ দেখা যায়, সত্য সত্য তাহা ততটা পালিশ নয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে কাগজের উপরিভাগ অনেক খস্‌খসে ও উঁচু-নীচু। কাগজের আঁশ-

গুলি অনেক সময় উপর হইতে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ আঁশগুলির ভিতর ভিতর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁক আছে। ব্লটিং কাগজের আঁশগুলির পরস্পারের ভিতরে অন্য কাগজ অপেক্ষা একটু বড় বড় অসংখ্য ফাঁক থাকে; সেজন্য কালি বা জলের উপর ব্লটিং কাগজ রাখিয়া দিলে ঐ সকল ছিদ্রপথ দিয়া কালি বা জল উপরে উঠিয়া আসে।

চায়ের ডিসের উপর সামান্য একটু দুধ বা চা রাখিয়া দিয়া উহার উপর একটি চিনির ডেলা রাখিয়া দিলে দেখিবে দুধ বা চা-টুকু চিনির ডেলাটি শুষিয়া লইয়াছে—অর্থাৎ চিনির কণাগুলির মধ্যে মধ্যে যে ফাঁক আছে দুধ বা চা তাহার ভিতর উঠিয়া গিয়াছে। দোয়াতের কালির ভিতর কলম ডুবাইলে নিবের ফাঁকের ভিতর দিয়া কালি ওঠা, স্নান করিবার পর শুষ্ক তোয়ালে দিয়া গায়ের জল মুছিয়া লওয়া বা লণ্ঠনের পলিতার ভিতরে তেল ওঠা ইত্যাদি কৈশিক আকর্ষণের আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

সরু ছিদ্র-পথ দিয়া তরল পদার্থের আপনা-আপনি উপরে উঠিবার যে ক্ষমতার কথা বলিলাম তাহা আমাদের পক্ষে বড় কম দরকারী নয়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে যাহাকে খুবই তুচ্ছ মনে করিতেছ তাহা না হইলে আমাদের একটুও চলে না।

মনে কর একদিন তরল পদার্থের উপর কৈশিক আকর্ষণের ক্ষমতা লোপ হইয়া গেল। গরম কাল। তোমার

সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভরিয়া গিয়াছে কিন্তু তুমি যে কাপড়-চোপড় পরিয়া আছ তাহা কিছুমাত্র ঘাম শুষিতে পারিতেছে না। তোয়ালে লইয়া গা হাত পা মুছিতে গেলে কিন্তু কোনই ফল নাই। তোয়ালের উপরে একটু ঘাম লাগিয়া গেল বটে, কিন্তু গায়ের ঘাম কিছুই শুষিয়া লইতে পারিল না—অয়েল ক্লথ বা রবার ক্লথ দিয়া গা মুছিলে যেমন হয় তাহাই হইল। তখন একখানি বড় স্পঞ্জ লইয়া ঘাম মুছিতে গেলে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। ক্রমে তোমার শীত লাগিল এবং তখন বিরক্ত হইয়া একটি তেলের ষ্টোভ জ্বালিয়া গায়ের ঘাম শুকাইয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলে। কি মুস্কিল! ষ্টোভও জ্বলিল না। পলিতা দিয়া উপরে তেল না উঠিলে ষ্টোভ জ্বলিবে কি প্রকারে? তখন অগত্যা রান্নাঘরের উনানের পাশে দৌড়িয়া গিয়া সেই আগুনে গরম হইয়া একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলে।

তারপর একটু স্থির হইয়া এই বিরক্তিকর ব্যাপারটা ডায়েরীতে লিখিতে গেলে। আর এক মুস্কিল—কলমের নিবে কালি উঠিল না। দোয়াতের ভিতর পেন্‌সিল বা কাঠি ডুবাইলে যেমন এক ফোঁটা মাত্র কালি ওঠে, কাগজের উপর সেইরূপ এক ফোঁটা কালির দাগ পড়িল মাত্র; সুতরাং লেখা গেল না। তখন ব্লটিং কাগজ দিয়া কালির ফোঁটা শুষিতে গেলে, কিন্তু উল্টা ফল হইল। রবার বা কাচ দিয়া চাপিলে যেমন হয় তেমনি কালির ফোঁটাটি চেপ্টা

হইয়া কাগজের খানিকটা জায়গা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে কাগজের কালির দাগ উঠাইবার জন্য যখন রবার দিয়া ঐ কালির দাগের উপর ঘসিলে তখন কাগজের উপর হইতে পেন্‌সিলের দাগ যেমন সহজে উঠিয়া যায়—তেমনি ঐ কালির দাগও সহজেই উঠিয়া গেল; কারণ কাগজের উপর পেন্‌সিলের দাগ দিলে উহা যেমন কাগজের ভিতর প্রবেশ করে না বলিয়া রবার দিয়া সহজে উঠান যায়, কৈশিক আকর্ষণ না থাকাতে কালি কাগজের আঁশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া উহাও রবার দিয়া সহজে উঠান গেল। সাধারণতঃ কালির দাগ রবার দিয়া সহজে উঠান যায় না, কারণ কালি কাগজের আঁশগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়া যায়—এবং তখন উপর হইতে ঘসিয়া তাহাকে তুলিয়া ফেলা যায় না। যাহা হৌক, তারপর ড্রায়েরীতে লিখিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া যেমন উঠিতে গেলে অমনি কালির দোয়াতটি উল্টিয়া টেবিল ক্লথের উপর পড়িয়া গেল। কিন্তু সুবিধার কথা এই যে একটি ব্রাশ দিয়া ঐ কালি ঝাড়িয়া দিলে টেবিল ক্লথটি সহজেই পরিষ্কার হইয়া গেল—উপরের কোন দাগ রহিল না। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ যে কালি আবার ব্রাশ দিয়া কি করিয়া ঝাড়া যায়। সাধারণতঃ ইহা কাপড়ের ভিতর চলিয়া যায় বলিয়া ঝাড়া যায় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কালি কাপড়ের আঁশের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়া ধূলা-বালি

ঝাড়িয়া ফেলার ন্যায় উহা কাপড় হইতে সহজেই ঝাড়িয়া ফেলা গেল।

ইহার পর আর এক মুস্কিল। তোমার বাগানের দিকে চাহিয়া দেখ—সব গাছপালা শুকাইয়া যাইতেছে। কারণ মাটির ভিতর হইতে রস গাছপালার শিকড়ের সরু ছিদ্র পথ দিয়া উপরে উঠিয়া তবেত উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে। কৈশিক আকর্ষণ না থাকাতে ঐ রস আর উপরে উঠিতে পারিতেছে না; সুতরাং সব গাছপালা শুকাইয়া যাইতেছে।

তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ কৈশিক আকর্ষণকে তুমি যতটা তুচ্ছ ও অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলে কার্য্যতঃ তাহা সত্য নয়।
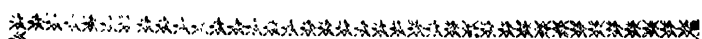
আঠায় জিনিষপত্র জুড়িবার কারণ কি ?

একটি গেলাসে খানিকটা জল ও অপর একটি পাত্রে খানিকটা পারা লও। পারার ভিতর তোমার একটি আঙ্গুল ডুবাইয়া উপরে উঠাইয়া লইলে দেখিবে যে আঙ্গুলে পারার একটি কণাও লাগিয়া নাই। এইবার, জলের ভিতর আঙ্গুল ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলে প্রথমে দেখিবে যে আঙ্গুল হইতে

টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল নীচে পড়িয়া যাইবে ও শেষে আঙ্গুলের চারিদিক ভিজিয়া থাকিবে এবং হয়ত আঙ্গুলের আগায় এক আধ ফোঁটা জল ঝুলিতে থাকিবে।

পারার ভিতর একটি আঙ্গুল ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলে আঙ্গুলে কিছুমাত্র পারা লাগিয়া থাকে না, অথচ জলের ভিতর ডুবাইয়া উঠাইয়া লইলে আঙ্গুলে জল আটকাইয়া থাকে ইহার কারণ কি? জলের অণুগুলি নিজেরা পরস্পর টানাটানি করে। আবার জলের ভিতর আঙ্গুল, পেন্সিল বা অন্য জিনিষ রাখিলে উহাদের অণুগুলির সঙ্গেও জলের অণুগুলির টানাটানি চলে। কিন্তু যখন জলের অণুগুলির নিজেদের মধ্যে টানাটানির জোর অপেক্ষা তাহাদের সহিত আঙ্গুলের অণুগুলির যে টানাটানি হয় তাহার জোর অধিক হয়, তখন আঙ্গুলটি উপরে উঠাইয়া লইলে জলের অণুগুলির উপর আঙ্গুলের অণুগুলির জোর টানের জন্য কতকগুলি জলকণা নিজেদের দল ছাড়িয়া উপরে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হয়।

তোমরা বোধ হয় জান না যে সকল জিনিষকেই পৃথিবী সর্ব্বদা নিজের দিকে টানে। পৃথিবীর এই টানের জন্যই গাছে আম পাকিলে উহা বোঁটা হইতে খসিয়া উপরে না গিয়া মাটিতে পড়ে, ঢিল ছুড়িলে বা ফুট্‌বল কিক্ করিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেও উহারা পুনরায় মাটিতে আসিয়া পড়ে। সকল জিনিসের উপর পৃথিবীর এই টান বা

আকর্ষণের নাম "মাধ্যাকর্ষণ"। ইহার বিষয় "বিজ্ঞানের খবর" নামক পুস্তকে ভাল করিয়া বলিয়াছি।

জলে আঙ্গুল ডুবাইয়া আঙ্গুল উঠাইয়া লইলে পৃথিবীর টান বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য প্রথমে কয়েক ফোঁটা জল নীচে পড়িয়া যায় কিন্তু যে জলকণাগুলি ঠিক আঙ্গুলের গায়ে লাগিয়া থাকে তাহাদের উপর পৃথিবীর টান অপেক্ষা উহাদের টানাটানির জোর বেশী বলিয়া উহারা পড়িয়া যায় না।

জলের এবং অন্য পদার্থের সহিত সংলগ্নতার জোর দেখিবার জন্য আর একটি পরীক্ষা করিতে পার। একখানি খুব পাতলা কাঁসার ডিসের কাণায় সূতা দিয়া ঝুলাইয়া সোজাসুজি জলের ঠিক উপরে রাখ যাহাতে ডিসের তলাটি জল স্পর্শ করে। এবার সূতা ধরিয়া ডিসখানি উপরে উঠাইতে গেলে দেখিবে যে অনেক জোর লাগিবে এবং খানিকটা জল ডিসের তলার সহিত আট্‌কাইয়া কিছুদূর উঁচু হইয়া উঠিয়া পরে ছাড়িয়া যাইবে। ডিসটির তলা যত প্লেন হইবে পরীক্ষা তত ভাল হইবে।

পারা আঙ্গুলের গায়ে লাগিয়া থাকে না, কারণ পারার কণাগুলির সহিত আঙ্গুলের কণাগুলির আট্‌কাইয়া থাকিবার জোর অপেক্ষা উহাদের নিজেদের ভিতরের টানাটানির জোর অধিক। এজন্য আঙ্গুল পারার কণাগুলিকে উহাদের দল হইতে ছাড়াইয়া লইতে পারে না।

গঁদ বা ময়দা ইত্যাদির আঠা দ্বারা যে জিনিষ জুড়িতে

পারা যায় তাহারও ঐ একই কারণ। তোমরা জান যে গঁদ বা ময়দা অল্প জলে গুলিয়া দুইখানি কাগজ বেশ জোড়া যায়, কারণ ঐ আঠা পাতলা অবস্থায় কাগজের প্রত্যেক খাঁজের বা উহার কণাগুলির প্রত্যেক ফাঁকের ভিতর প্রবেশ করে। পরে আঠার জলীয় অংশ শুকাইয়া গেলে গঁদ বা ময়দার কণাগুলির ও কাগজের কণাগুলির ভিতর সংলগ্নতা শক্তির জোরে দুই খণ্ড কাগজ জুড়িয়া যায়। শুক্‌নো গঁদ বা ময়দা দিয়া জিনিষ জোড়া যায় না; কারণ শুক্‌নো জিনিষ যতই মিহি হৌক উহারা কাগজের বা অন্য কোন জিনিষের প্রত্যেক খাঁজে খাঁজে-প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা না পারিলে—অর্থাৎ উহারা গায়ে-গায়ে না মিশিলে—আসঞ্জনের শক্তি কাজ করে না। এইজন্যই আঠালো জিনিষগুলিকে প্রথমে জল দিয়া গুলিয়া তরল করা হয় যাহাতে উহাদের কণাগুলি অন্য জিনিষের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাঁজের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহার পর জল শুকাইয়া গেলে উহারা দুইটি জিনিষকে আটকাইয়া রাখিতে পারে। অবশ্য তরল করিবার জন্য সকল সময় জলের দরকার হয় না। গালা দিয়া জিনিষ জুড়িবার সময় উহাকে আগুনে গলাইয়া একটু তরল করিয়া লওয়া হয়। পরে ঠাণ্ডা হইলে উহা পুনরায় শুকাইয়া যায় এবং তখন জিনিষ আটকাইয়া রাখিতে পারে।

জিনিষ জুড়িবার জন্য নানাপ্রকার আঠার ব্যবহার

তোমরা দেখিয়াছ। কাগজ ইত্যাদিকে জুড়িবার জন্য গঁদ, ময়দা, গালা ইত্যাদি ব্যবহার হয়, আবার ধাতুর জিনিস জুড়িতে গেলে সাধারণতঃ টিন গলাইয়া ঝালা দেওয়া হয়। ইট, পাথর জুড়িতে হইলে চুণ, বালি ও জল মিশানো মস্‌লা অথবা সিমেণ্ট মাটি ব্যবহার হয়, এবং কাঠ জুড়িতে হইলে শিরীষের আঠা লাগে। এই শিরীষ জীব-জন্তুর শিং, চামড়া ইত্যাদি আগুনে পুড়াইয়া তৈরী করা হয়। এইরূপ যে কোন আঠাই ব্যবহার কর না কেন উহাদের সংলগ্নতা শক্তির জোরই জিনিষ জুড়িবার কারণ।

বোর্ডের উপর খড়ির দাগ দেওয়া বা কাগজের উপর পেন্‌সিলে দাগ দিয়া লেখাও এই সংলগ্নতা শক্তির জন্যই সম্ভব হইয়া থাকে। এই শক্তি না থাকিলে খড়ির গুঁড়াগুলি বোর্ডের উপর বা পেন্‌সিলের গুঁড়া কাগজের উপর লাগিয়া থাকিত না, ঝুরঝুর করিয়া পড়িয়া যাইত।

তোমরা জান যে তাড়াতাড়ি বইয়ের পাতা উল্টাইবার সময় আঙ্গুল একটু জলে ভিজাইয়া লইলে খুব সুবিধা হয়। আসঞ্জন শক্তিই ইহার কারণ। শুক্‌নো আঙ্গুল কাগজের উপর দিলে কাগজের ভিতর সামান্য ফাঁক থাকিয়া যায়, সেজন্য আসঞ্জন শক্তি ভাল কাজ করিতে পারে না। কিন্তু আঙ্গুল ভিজা থাকিলে জল আঙ্গুল ও কাগজ উভয়ের খাঁজে-খাঁজে প্রবেশ করে, সেজন্য সংলগ্নতার শক্তির জোরে আঙ্গুলের সহিত কাগজখানি সহজে উঠিয়া আসে।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা বাতাসে উড়িয়া ঘরের দেওয়ালের উঁচু-নীচু খাঁজের ভিতর চলিয়া যায় এবং সংলগ্নতা শক্তির জন্য তাহারা সেখানে আট্‌কাইয়া থাকে। ঘরের দেওয়াল বা ছাদের গায়ে ধূলা-বালি বা মাকড়সার জাল আট্‌কাইয়া থাকিবার ইহাই কারণ। দেওয়াল যদি ভিজা বা তৈলাক্ত থাকে তবে ধূলা-বালি আরও অধিক আট্‌কাইয়া যায়, কারণ এরূপ ক্ষেত্রে ধূলিকণাগুলি অতি সহজেই দেওয়ালের গা এবং তেল বা জলের অধিক নিকটে যাইতে পারে। এজন্য ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় অধিক ধূলা জমিয়া আমাদের মুখ বা গা যত শীঘ্র ময়লা হয় শুষ্ক অবস্থায় তত হইতে পারে না।

এই আসঞ্জনের বা সংলগ্নতার শক্তি জগৎ হইতে হঠাৎ একদিন লোপ পাইলে বড় কম মজা হয় না। তখনই দেখিবে যে ঘরের ভিতরে ধূলামাটি বা মাকড়সার জাল সব ঝুপঝাপ করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া যাইবে এবং ঘরের ছাদ ও দেওয়াল পরিষ্কার হইয়া যাইবে। চেয়ার, টেবিল, আলমারির বার্ণিস এবং দরজার অথবা অন্য যেখানে যত রং লাগান আছে সব রং শুক্‌নো বালির মত খসিয়া পড়িয়া যাইবে। ঘর বাড়ীর গাঁথুনি সব ঢিলা হইয়া পড়িয়া যাইবে।

আসঞ্জন শক্তি না থাকিলে স্কুলের মাষ্টার মহাশয় বড় মুস্কিলে পড়িবেন। অঙ্ক বুঝাইবার সময় বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া যত জোরেই লিখিতে চেষ্টা করুন, কোনই দাগ

পড়িবে না আবার পেন্‌সিল দিয়া তোমরা খাতার অঙ্ক কষিতে গেলে কাগজের উপরেও কোন দাগ পড়িবে না।

আর এক মজা। ভাত খাইয়া হাত মুখ ধুইবার কোন দরকার হইবে না, কারণ হাতে বা মুখে কিছুমাত্র জিনিষ লাগিয়া থাকিবে না—আর জল দিয়া ধুইতে গেলেও হাতে জল আট্‌কাইয়া থাকিবে না। স্নান করিবার সময় পুকুরের জলে ডুব দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিবে যে কাপড়-চোপড় একটুও ভিজে নাই। সব জল গড়াইয়া পড়িয়া কাপড়-চোপড় যেমন শুক্‌নো ঠিক তেমনিই আছে। আসঞ্জন না থাকাতে কৈশিক আকর্ষণও নাই; সুতরাং কাপড়-চোপড়ের ভিতর জল ঢুকিতে পারে নাই।

কিন্তু আর এক বিপদ আছে। আসঞ্জন না থাকিলে আমাদের গায়ের চামড়া শুকাইয়া ফাটিয়া যাইবার মত হইবে, চোখ শুকাইয়া যাইবে, মুখের ভিতর বা জিহ্বায় বিন্দুমাত্র রস থাকিবে না এবং সেজন্য কথা বাহির হইবে না। সুতরাং মোটের উপর কিছু কিছু সুবিধা হইলেও অসুবিধার ভাগই বেশী।

ভাতের উথ্‌লানো ফেনের উপর তেল দিলে কি ফল হয় ?

তোমরা হয়ত অনেক সময় দেখিয়া থাকিবে যে মাকড়সা জলের উপর চলিয়া বেড়াইতেছে। ইহা আশ্চর্য্য নয় কি ? মাকড়সা যতই হাল্‌কা হৌক না কেন ইহার সামান্য কিছু ওজন ত আছে. সুতরাং ইহার পাগুলি জলের ভিতর বসিয়া যায় না কেন ? মনে হয় যেন জলের উপরিভাগে খুব সূক্ষ্ম রবারের পর্দ্দার ন্যায় কিছু বিছান আছে যাহার উপর দিয়া মাকড়সা বেড়াইতে পারে। ইহা কেন হয় তাই বলি। কোন পাত্রে জল রাখিলে ঐ জলের অণুগুলি চারিদিকে নিজেদের টানাটানি করে সে কথা তোমাদের বলিয়াছি ; কিন্তু জলের যে অণুগুলি একেবারে উপরে থাকে তাহাদের বাহিরে আর কোন অণু না থাকাতে বাহির বা উপরের দিক হইতে তাহাদিগকে কেহই টানে না ; তাহাদের টান কেবল ভিতরের দিকেই থাকে এবং ইহার ফলে জলের উপরের তলটা অনেকটা অতি সূক্ষ্ম পর্দ্দার ন্যায় কাজ করে। মাকড়সা এত হাল্‌কা যে অনায়াসে ঐ পর্দ্দার উপর চলিয়া বেড়াইতে পারে। এই একই কারণে কোন

পাত্রে জল রাখিয়া জলটি স্থির হইলে একটি সরু সূচ খুব আস্তে আস্তে জলের উপর রাখিলে দেখিবে যে সূচটি ভাসিতে থাকিবে—অবশ্য জল নড়িলে সূচটি তখনই ডুবিয়া যাইবে। সূচটির গায়ে সামান্য গলান মোম লাগাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

জলের উপরিতলের এইরূপ টানের জন্যই বৃষ্টির জলের ফোঁটাগুলি উপরের চারিদিকের টানে গোল হইয়া যায়, এবং এই টানের জন্যই ভাত বা ডাইল রাঁধিবার সময় উহাদের ফেন ফুলিয়া উপরে উঠে ও শেষে হাড়ির বাহিরে পড়িয়া যায় তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। জলের ভিতরে যে হাওয়া থাকে তাহা গরমে উপরের দিকে উঠিতে চায়, কিন্তু জলের উপরের তলটি টান্‌টান্ থাকে বলিয়া তাহাকে ভেদ করিয়া সহজে বাহিরে যাইতে পারে না, এবং সেজন্য সবশুদ্ধ ফুলিয়া উপরের দিকে উঠে। এইরূপে ফেন হাঁড়ি হইতে উথলিয়া পড়ার সময় অনেকে উহার উপরে একটু তেল ছড়াইয়া দেন আর তখনই সব ঠাণ্ডা হইয়া যায়; অর্থাৎ ফেন আর উথলিয়া না পড়িয়া হাঁড়ির ভিতর চলিয়া যায়। উপরে তেল দিলে এরূপ হয় কেন নিশ্চয়ই জান না। উপরে তেল দিলে ঐ তেল গড়াইয়া তখনই জলের উপরিভাগ অধিকার করে, সুতরাং তখন জলের একেবারে উপরিতলে জলের বদলে তেলের সর থাকে। জলের উপরিভাগের অণুগুলির তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কেবল মাত্র নীচের দিকে টান থাকে

না ও সেই কারণে সেরূপ সূক্ষ্ম পর্দ্দার ন্যায় কাজ করিতে পারে না। আর জলের অণুগুলি একেবারে উপরে থাকিলে উহারা সকলে মিলিয়া যেমন পর্দ্দার ন্যায় কাজ করে তেলের অণুগুলি উপরে থাকিলেও সেরূপ করে না. সেজন্য ভিতরের হাওয়া ফুলিয়া উঠিবার আগেই সহজেই বাহির হইয়া যায়; সুতরাং ফেনও আর উথলিয়া উঠে না।

জল তরল ও লোহা কঠিন কেন?

পূর্ব্বেই তোমাদের বলিয়াছি যে, জল, দুধ, মাটি, লোহা, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিষই উহাদের খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সংযোগে তৈরী। এই ছোট ছোট কণার নাম অণু; অর্থাৎ জল জলের অণুর দ্বারা, লোহা লোহার অণুর দ্বারা ও দুধ দুধের অণুর দ্বারা তৈরী। এই অণুগুলির পরস্পার পরস্পরকে সর্ব্বদাই টানাটানি করে। সীসার অণুর টানাটানির জোর লোহার অণুর জোর অপেক্ষা কম বলিয়া একখণ্ড সীসাকে একখণ্ড লোহা অপেক্ষা সহজে ভাঙ্গা যায়। আর একই কারণে ইটকে পাথর অপেক্ষা সহজে ভাঙ্গা যায়।

যে সব পদার্থের অণুগুলি খুব কাছাকাছি থাকে তাহাদের নিজেদের মধ্যে টানাটানির জোর খুব বেশী, সেজন্য তাহাদিগকে সহজে ভাঙ্গা যায় না—অর্থাৎ তাহাদের অণুগুলিকে সহজে পরস্পরের টান হইতে ছিনাইয়া তফাৎ করা যায় না। কাঠ, পাথর, তামা, লোহা ইত্যাদি জিনিষের অণুগুলি খুব কাছাকাছি থাকে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণের জোর বেশী, সেজন্য ইহাদের সহজে ভাঙ্গা যায় না। ইহাদিগকে আমরা **কঠিন জিনিষ** বলি। আবার কঠিন জিনিষের ভিতরেও মাটি, কাঠ, লোহা ইত্যাদি সকলের অণুগুলির নিজেদের মধ্যে টানাটানির জোর সমান নয়, আর এই টানাটানির জোরের কম বেশীর জন্যই লোহা সীসা অপেক্ষা শক্ত, পাথর মাটি অপেক্ষা শক্ত; আবার হীরা লোহা অপেক্ষা আরও শক্ত। আবার কঠিন জিনিষের অণুর টানাটানির জোর অপেক্ষা তরল জিনিষের অণুর টানাটানির জোর অনেক কম। আর এজন্যই লোহা শক্ত আর জল তরল। জল, তেল ইত্যাদি তরল জিনিষের অণুগুলি কঠিন জিনিষের অণুগুলি অপেক্ষা বেশী ফাঁক ফাঁক থাকে বলিয়া উহাদের টানাটানির জোর, কঠিন জিনিষের অণুগুলির টানাটানির জোর অপেক্ষা অনেক কম। এইজন্য কঠিন জিনিষের ন্যায় তরল জিনিষের কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই—অর্থাৎ পাথর বা লোহাকে যেমন গোল, লম্বা যে কোন আকার দেওয়া যায়—জল বা তেলের বেলা তাহা সম্ভব নয়

সেজন্য তরল পদার্থকে সর্ব্বদা কোন পাত্রের ভিতর রাখিবার দরকার হয়। আবার বাতাস বা অন্যান্য গ্যাসের অণুগুলি এত ফাঁক ফাঁক থাকে যে তাহাদের ভিতর এই টানাটানির জোর একেবারে নাই বলিলেই হয়। সেজন্য খানিকটা বাতাস বা অন্য কোন গ্যাস একটা ছোট জায়গার ভিতর আটকাইয়া রাখিলে গ্যাসটি সেই জায়গা ভরিয়া থাকিবে। আবার উহাকে খুব বড় জায়গার ভিতর রাখিয়া দিলে উহার অণুগুলি ক্রমে চারিদিকে ছড়াইয়া যাইবে, এবং ক্রমে সেই জায়গাটিও ভরিয়া যাইবে। জলকে আগুনে ফুটাইলে উহার অণুগুলির টানাটানির জোর কমিয়া যায় বলিয়া তখন সব অণুগুলি খুব ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়ে। জলের এই অবস্থাকে আমরা **জল-বাষ্প** বলি।

একখানি ইট লইয়া উপর হইতে ফেলিয়া দিলে উহা ভাঙ্গিয়া যায়, কারণ ধাক্কা খাইয়া উহার কতকগুলি অণুর টান ছিঁড়িয়া যায়। তোমরা হয়ত বলিবে যে যদি কাছাকাছি আনিলে উহাদের অণুগুলি পরস্পরকে টানাটানি করে তবে ভাঙ্গা ইটখানির টুক্‌রাগুলি পুনরায় একসঙ্গে ঠিক জায়গায় রাখিলে অণুগুলির টানাটানির ফলে উহারা জুড়িয়া যায় না কেন? ইহার কারণ অণুগুলি পরস্পর খুব কাছাকাছি না পৌঁছিলে উহাদের টানাটানির শক্তি কাজ করে না। ভাঙ্গা ইটের দু'টি টুক্‌রা মুখোমুখি রাখিলেও উহাদের ভিতর অনেক ফাঁক থাকে তাহা শুধু চোখেই দেখিতে পাওয়া যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে আরও কত বেশী ফাঁক দেখা যায়। খুব পালিশ দুইখানি কাচফলক লইয়া একটির উপর আর একটি রাখিয়া দিলে দেখিবে যে উহাদের ছাড়াইয়া লওয়া কত মুস্কিল। ইহার কারণ এই যে খুব পালিশ বলিয়া কাচফলক দুটির মধ্যে কাচের অণুগুলি খুব কাছাকাছি আসে এবং সেজন্য তখন উহারা টানাটানি করে।

অণুগুলির পরস্পরের এই টানাটানির শক্তি বড় কম দরকারী নয়। এই টানাটানির শক্তি না থাকিলে সব জিনিসেরই অণুগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া বহুদূরে চলিয়া যাইবে। যদি একদিন হঠাৎ এই শক্তি বন্ধ হইয়া যায় তবে কি কাণ্ড হয় ভাবিয়া দেখ। তখনই ঘর-দুয়ার সব ধপাধপ্ পড়িয়া ধূলায় পরিণত হইবে। তুমি উপরের ঘরে দাঁড়াইয়া থাকিলে তখনই নীচে পড়িয়া যাইবে, কিন্তু সুবিধার বিষয় এই যে বিশেষ আঘাত পাইবে না; কারণ নীচে ত তখন শক্ত জিনিষ বলিয়া কিছুই থাকিবে না; সবই যে ধূলা-বালির স্তূপ। আর টানাটানির বা আশ্লেষণ শক্তি না থাকিলে তোমার নিজের শরীরও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। পাহাড়, পর্ব্বত, গাছপালা, জীব-জন্তুর কোথাও চিহ্ন থাকিবে না। এই সামান্য টানাটানির অভাবে তখন শুধু বাষ্পময় প্রাণহীন এক নূতন জগত পড়িয়া থাকিবে।

চিনি জলে গলিয়া কোথায় যায় ?

একেবারে কাণায় কাণায় ভরা এক গেলাস জল লইয়া উহার ভিতর কিছু বালি আস্তে আস্তে দিতে থাক। দেখিবে যে যতই বালি গেলাসের ভিতর দিবে ততই গেলাস হইতে জল উছলিয়া বাহিরে পড়িয়া যাইবে। এইবার পুনরায় ঐরূপ জল ভরা আর একটি গেলাস লইয়া উহার ভিতর বালির বদলে অল্প অল্প চিনি দাও। একটু পরেই জলের ভিতর আর চিনির চিহ্ন দেখিতে পাইবে না এবং একটুও জল এবার বাহিরে পড়িবে না। এবার গেলাস হইতে জল বাহিরে উছলিয়া না পড়িবার কারণ কি ? আর চিনির দানাগুলিবা জলের ভিতর কোথায় লুকাইয়া গেল ?

তোমরা বলিবে যে জল চিনিকে গলাইয়া ফেলিয়াছে বলিয়া উহা জলের সহিত মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা ঠিক কথা, কিন্তু জলের সহিত মিশিলেও উহা ত গেলাসের মধ্যেই আছে, সুতরাং প্রথম গেলাসের মধ্যে বালির জায়গা দিবার জন্য যেমন কিছু জল বাহিরে উছলিয়া পড়িয়াছিল, সেইরূপ এবারেও চিনির জায়গা দিবার জন্য জল

বাহিরে আসিল না কেন ? জল ত গেলাসে মুখোমুখি ভরা ছিল সুতরাং কিছু জল বাহির না করিয়া উহার মধ্যে চিনির জায়গা কিরূপে হইল ?

কিরূপে জলের মধ্যে চিনির জায়গা হইল তাহা বুঝিবার পূর্ব্বে আর একটি মজার পরীক্ষা কর। একটি গেলাসে যতটা পার চাপিয়া চাপিয়া মুখ পর্য্যন্ত বালি ভর—যাহাতে আর একটুও গেলাসে না ধরে। তুমি ভাবিতেছ যে গেলাসে আর কিছুমাত্র জায়গা নাই। আচ্ছা, এইবার ঐ গেলাসের ভিতর আস্তে আস্তে জল ঢালিলে দেখিবে যে একটিও বালির কণা বাহিরে পড়িবে না, অথচ অনেকটা জল গেলাসের ভিতর আঁটিয়া যাইবে। এই জলের জায়গা কোথা হইতে আসিল ? তুমি বালি যতই চাপিয়া গেলাসে ভর, বালুকণাগুলির মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকিবেই, আর জল যাইয়া সেই ফাঁকগুলি দখল করে বলিয়া একটিও বালির কণাকে গেলাস হইতে না সরাইয়াও জলের জায়গা হইয়া যায়। অবশ্য বেশী জল দিলে যখন সব ফাঁকগুলি ভরিয়া যাইবে তখন জল বাহিরে উছলিয়া পড়িবে।

এইবার এক গেলাস জলের মধ্যে চিনি দিলে উহার দানাগুলি কোথায় লুকাইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারিবে। প্রথম কথা এই যে চিনি, লবণ ইত্যাদি কতকগুলি কঠিন জিনিস জলে দিলে গলিয়া যায়—অর্থাৎ জল ঐ সমস্ত জিনিসের বড় বড় দানাগুলিকে ভাঙ্গিয়া খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে

বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং তখন ঐ সূক্ষ্ম অংশগুলি জলের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। সুতরাং কোন জিনিষ গলিয়া গিয়াছে—এ-কথার অর্থ এই যে, জিনিষটি ভাঙ্গিয়া খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইট, কাঠ, তেল, চিনি, জল, লবণ ইত্যাদি সকল জিনিসই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অর্থাৎ অণুর সংযোগে তৈরী এবং প্রত্যেক জিনিষেরই অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে একটু না একটু ফাঁক আছে এ কথা তোমাদের অনেকবার বলিয়াছি। ইট, কাঠ ইত্যাদি কঠিন জিনিস অপেক্ষা তেল, জল ইত্যাদি তরল জিনিসের অণুগুলির মধ্যের ফাঁক অধিক। আবার বাতাস ও অন্যান্য গ্যাসের অণুগুলির মধ্যের ফাঁক আরও অধিক। জল যখন চিনিকে গলায় অর্থাৎ চিনির দানাকে ভাঙ্গিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা বা অণুতে পরিণত করে, তখন ঐ চিনির অণুগুলি জলের ভিতর চারিদিকে ছড়াইয়া জলের অণুগুলির ফাঁকে ফাঁকে লুকাইয়া যায়, সেজন্য উহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন সেই জলের শুধু আস্বাদ লইয়া উহাতে চিনির অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। যদি ঐ গেলাসের জলে একটু একটু করিয়া ক্রমে অনেক চিনি দিয়া ফেল তখন দেখিবে যে কতক চিনি না গলিয়া গেলাসের নীচে জমিয়া যাইবে ; কারণ চিনির অণুগুলি যখন গেলাসের জলের অণুগুলির পরস্পরের ভিতরের সব ফাঁকগুলি দখল করিয়া বসে, তখন ঐ জল চিনির দানাগুলিকে আর ভাঙ্গিতে

পারে না—অর্থাৎ চিনিকে আর গলাইতে পারে না। সুতরাং সে সময় ঐ পুরোপুরি জলভরা গেলাসে আরও চিনি দিলে সে চিনির দানাগুলি ভিতরে আর ফাঁক না পাইয়া নিজেদের জায়গা করিবার জন্য জলের অণুগুলিকে উপরে ঠেলিয়া দিবে এবং সেজন্য কিছু জল গেলাসের বাহিরে উছলিয়া পড়িবে। বালি, পাথর প্রভৃতি যে সব জিনিসকে জল গলাইতে পারে না অর্থাৎ উহাদের কণাগুলিকে ভাঙ্গিয়া আর ছোট করিতে পারে না, তাহারা জলের অণুগুলির মধ্যের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফাঁকের ভিতর ঢুকিতে পারে না। এজন্য জল ভরা গেলাসের ভিতর বালি বা পাথরের টুক্‌রা দিলে তাহারা প্রথম হইতেই জলকে উপরে ঠেলিয়া দিয়া নিজেদের জন্য জায়গা দখল করে। কাজে কাজেই গেলাস হইতে কিছু জল বাহিরে পড়িয়া যায়।

আর একটি জিনিস হয়ত তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে যখন গেলাসের জল চিনিকে আর গলাইতে পারিতেছে না, এবং চিনি দিলে সবটা গেলাসের নীচে জমিয়া যাইতেছে, তখন ঐ জলকে কাঠি দিয়া বা আর এক গেলাসে ঢালা উপুড় করিয়া নাড়াইয়া দিলে আরও খানিকটা চিনি গলিয়া যাইবে ; কারণ তখন চিনির অণুগুলি তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে উপরে নীচে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া যে সব ফাঁক দখল করা বাকি থাকে সেগুলির ভিতর চলিয়া যায়। আবার ঐ জলকে গরম করিলে আরও অধিক চিনি গলিতে পারে,

কারণ জলের উত্তাপ বাড়িলে উহার অণুগুলি আরও অধিক ফাঁক ফাঁক হইয়া যায়—এবং তখন আরও অধিক চিনির অণু সেই সকল ফাঁক দখল করিতে পারে।

জল যে অতি সহজেই অনেক জিনিষ গলাইতে পারে তাহা তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাও। আলকোহল, পেট্রোল ইত্যাদি অন্যান্য জিনিষও ঘি, চর্ব্বিকে গলাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের—বিশেষতঃ জলের—এই গলাইবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গেলে পৃথিবীতে যে কত গণ্ডগোল বাধিয়া যায়, তাহার হিসাব তোমরা রাখ না। সেই কথাটি মোটামুটি হিসাবে তোমাদের বলিতেছি।

হঠাৎ একদিন এই গলান কাজটি বন্ধ হইয়া গেলে প্রথমেই সকালে উঠিয়া চা খাইবার সময় দেখিবে যে চায়ে কোনই আস্বাদ নাই। চায়ের পাতাগুলি জলে মিশে নাই। তাহা ছাড়া সব চিনি বাটির নীচে জমিয়া আছে বলিয়া চা ঠিক জলের মত লাগিতেছে। তুমি ভাবিলে চিনির কি মিষ্টতা নাই? কাপের নীচে হইতে চামচ দিয়া একটু চিনি তুলিয়া মুখে দিলে। সত্যই ত চিনিরও কোন আস্বাদ নাই—কতকটা সাদা বালির সহিত ইহার কোনই তফাৎ নাই। তারপর পরীক্ষা করিবার জন্য একটু নুণ লইয়া মুখে দিয়া দেখিলে যে নুণেরও কোন আস্বাদ নাই—কারণ মুখের ভিতর নুণ বা চিনি না গলিয়া গেলে উহার আস্বাদ পাইবে কিরূপে? এইরূপে ঝাল, পেঁয়াজ ইত্যাদির কিছুরই

আস্বাদ পাওয়া যাইবে না—যদিও উহাদের গন্ধের কোন তারতম্য হয় নাই।

অন্যদিকে সমুদ্রের জলের লবণ সব তলে জমিয়া গিয়া সব জল পুকুরের জলের মত পরিষ্কার হইবে। মোটেই লোণা থাকিবে না। ইহাতে লোণা জলের মাছগুলি সব মরিয়া যাইবে। আবার আমাদের রক্তের ভিতর যে লবণ মিশিয়া থাকে উহার দানাগুলি সব শক্ত হইয়া নীচে বসিয়া থাকিবে; এবং রক্তের সহিত লবণ মিশ্রিত না থাকাতে আমাদের রক্ত শক্তিহীন হইয়া যাইবে। ক্রমে মানুষ নির্জীব হইয়া মরিয়া যাইবে।

গাছপালাও সব শুকাইয়া যাইবে। কারণ যে রস দেহের ভিতর শুষিয়া লইয়া উহারা বাঁচে সেই রসের ভিতর জল ও অন্য জিনিস মিশানো থাকে; কিন্তু জল যদি সে সব জিনিস গলাইয়া গাছের বাঁচিবার উপযুক্ত রস তৈরী না করে তবে শুধু জল শোষণ করিয়া গাছ বাঁচিবে না।

গলান কাজটা তোমরা সামান্য ভাবিতে পার, কিন্তু দেখ তাহা বন্ধ হইলেই জগতে জীবজন্তু গাছপালা কিছুই থাকিবে না। শুধু নদী ও সাগরের পরিষ্কার জলের পাশে জীবজন্তু গাছপালাশূন্য মরুভূমি পড়িয়া থাকিবে।

——:※:——

সোডা দ্বারা ময়লা কাপড় পরিষ্কার হয় কেন ?

চিনি, লবণ ইত্যাদি অধিকাংশ জিনিষকেই জল সহজেই গলাইতে পারে. কিন্তু পিচ, রবার, গালা, মোম, চর্ব্বি, তেল, কর্পূর ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ আছে যাহারা জলে গলে না। জলে না গলিলেও মেথিলেটেড্ স্পিরিট, আল্‌কোহল, টার্পিন, পেট্রোল, বেন্‌জিন ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ উহাদের গলাইতে পারে।

বেন্‌জিন্, পেট্রোল ইত্যাদি কেরোসিন তেলের মত খনিজ তেল। পেট্রোল মোটর গাড়ী ইত্যাদি চালাইবার জন্য ব্যবহার হয়।

কর্পূর ও গালা জলে গলে না কিন্তু স্পিরিট বা আল্‌-কোহলে বেশ ভাল গলে। পিচ ও রবার বেন্‌জিনে বেশ ভাল গলে। মেথিলেটেড্ স্পিরিটে গালা গলাইয়া চেয়ার, টেবিল বার্ণিস করা হয়। আর পেট্রোল, বেন্‌জিন, টার্পিন ইত্যাদি জিনিষ তেল বা চর্ব্বিকে বেশ ভাল গলায় বলিয়া অনেক ময়লা জিনিষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার কাজে ইহাদিগকে ব্যবহার করা হয়।

শুধু শুক্‌নো ধূলা পড়িলে কাপড়-চোপড় ঝাড়িলেই পরিষ্কার হয়; কিংবা কাদা ইত্যাদি লাগিয়া থাকিলে জলে কাচিয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দেখি যে ময়লা কাপড় শুধু জলে ধুইলে ভাল পরিষ্কার হয় না। ইহার কারণ এই যে কাপড়-চোপড়ে শুধুই ধূলাবালি থাকে না। ধূলাবালি তেল, চর্ব্বি ইত্যাদির সহিত মিশিয়া কাপড়-চোপড়ে আট্‌কাইয়া থাকে; তেল, চর্ব্বি জলে গলে না বলিয়া শুধু জলে কাচিলে ময়লা কাপড় পরিষ্কার হয় না। যে সব জিনিস তেল, চর্ব্বি ইত্যাদিকে গলাইয়া দেয় সেই সব জিনিষে কাপড়-চোপড় কাচিলে তবে পরিষ্কার হয়। সোডা দিয়া ময়লা কাপড় পরিষ্কার করা হয় তাহা তোমরা জান। ইহার কারণ সোডা তেল বা চর্ব্বির সহিত মিশিয়া এমন একটি জিনিষ তৈরী করে যাহা জলে গলিয়া যায়। সেজন্য সোডার জলে ধুইলে কাপড়-চোপড়ের ময়লা ছাড়াইয়া আসে। সাবান দিয়াও ঐরূপ ময়লা পরিষ্কার হয়, কারণ সাবান, তেল চর্ব্বি দ্বারা আট্‌কানো ধূলা বালির কণাগুলিকে আল্‌গা করিয়া দেয় এবং তখন জল দিয়া ধুইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। সাবান কি করিয়া তৈরী হয় জান কি? চর্ব্বির বা তেলের সহিত কোন ক্ষার জিনিষকে জ্বাল দিলে মোটামুটি ভাবে সাবান তৈরী করা যায়। ক্ষার জিনিষ কাহাকে বলে বোধ হয় জান না। তেঁতুল, নেবু ইত্যাদিকে আমরা টক্ জিনিষ বলি। নেবুর

রসে সোডা দিলে দেখিও যে বুজ্‌বুজ্‌ করিয়া গ্যাস বাহির হইবে। তখন ঐ নেবুর রসটি মুখে দিলে আর ততটা টক্‌ লাগিবে না।

ইহার কারণ সোডা নেবুর রসের অম্লত্ব নষ্ট করে; সুতরাং নেবুর ধর্ম্ম যেমন অম্লত্ব, সোডার ধর্ম্ম অম্লত্বের উল্টা। এইরূপ অম্লত্বের উল্টা ধর্ম্ম বিশিষ্ট জিনিসকে "ক্ষার" বলে। সাজিমাটি, সোডা, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি সব ক্ষার জিনিষ। চূণ ক্ষার পদার্থ। চূণের জলে অম্লরস মিশাইলে অম্লের তীব্রতা নষ্ট হয়; সেজন্য অম্লরোগী চূণের জল পান করে। এই সব ক্ষার জিনিস গোলা জলে ময়লা কাপড় ধুইলে উহা সহজে পরিষ্কার হয় বটে কিন্তু কাপড়-চোপড় উহা দ্বারা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। সোডার জলে হাত বা মুখ ধুইলে আমাদের চামড়া কিরূপ খস্‌খসে হইয়া যায় তাহা তোমরা জান। কাপড় কাচা সাবান বা অন্যান্য কমদামী সাবান দিয়া হাত মুখ ধুইলেও ঐরূপ হয়; কারণ সাবান ক্ষার ও চর্ব্বি মিশাইয়া তৈরী হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কমদামী সাবানগুলিতে ক্ষারের ভাগ বেশী থাকে বলিয়া চামড়া ঐরূপ খস্‌খসে হয়। খুব ভাল সাবানে ক্ষারের ভাগ বেশী থাকে না বলিয়া এরূপ হয় না।

ধোপারা সাধারণতঃ কাপড়-চোপড়ের ময়লা সোডা ও কমদামী সাবান দিয়াই পরিষ্কার করে। আজকাল অনেক সহরে ডাইং ক্লিনিং (Dyeing and Cleaning) এর অর্থাৎ

জামা-কাপড় ধুইবার ও রং করিবার দোকান হইয়াছে। এরূপ কোন কোন দোকানে লেখা থাকে—"এখানে ড্রাই ক্লিনিং (Dry cleaning) হয়"—অর্থাৎ বিনা জলে কাপড়-চোপড় ধোওয়া হয়। সোডা বা সাবানের জলে সিদ্ধ করিলে কাপড়-চোপড় জীর্ণ হইয়া যায় এবং তারপর উহাদিগকে আছড়াইয়া কাচিলে রেশমী পশমী ইত্যাদি ভাল কাপড়-চোপড়ের বুনট বা জমি নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য ঐ সকল ভাল কাপড়-চোপড় সোডার জলে না কাচিয়া পেট্রোল বা বেন্‌জিনের ভিতর ডুবাইয়া লইলে উহাদের তেল চর্ব্বি ইত্যাদি গলিয়া ধূলাবালি সব আলগা হইয়া যায়। তখন উঠাইয়া শুকাইয়া ঝাড়িয়া লইলে কাপড়-চোপড় বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। সাধারণতঃ পেট্রোলই অধিক ব্যবহার হয়। পেট্রোল বা বেন্‌জিন অতি সহজেই বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায় বলিয়া ইহাদের ভিতর কাপড়-চোপড় ডুবাইয়া উপরে উঠাইয়া লইতে লইতেই শুকাইয়া যায়। ইহাতে জলের দরকার হয় না, সেজন্য ইহাকে "শুক্‌নো ধোওয়া" বলা হয়। অবশ্য ইহাতে খরচ অনেক বেশী পড়ে।

রৌদ্রে দাঁড়াইলে আমাদের ছায়া ছোট বড় দেখায় কেন ?

তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছ যে রৌদ্রে দাঁড়াইলে আমাদের দেহের যে ছায়া পড়ে তাহা সকাল বেলা যত লম্বা দেখায়, দুপুর বেলা তার চেয়ে অনেক ছোট দেখায়, বৈকালে আবার লম্বা হইয়া যায়। একই জিনিসের ছায়া একবার ছোট ও একবার বড় হয় কেন বল ত ?

লণ্ঠনের বা অন্য যে কোন আলোর সম্মুখে বই, লাঠি, পেন্‌সিল ইত্যাদি কোন জিনিস রাখিলেই তাহার ছায়া পড়ে তাহা তোমরা জান। লণ্ঠন হইতে জিনিষটির দূরত্ব কম বেশী করিলে দেখিবে যে ছায়াটির দৈর্ঘ্যও ছোট বড় হইয়া যাইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখ। ঘরের মেঝের উপর একটি লাঠি সোজা করিয়া রাখ এবং উপর হইতে একটি লণ্ঠন ঝুলাইয়া দাও। লাঠিখানি ঘরের মাঝখানে রাখিয়া লণ্ঠনটি প্রথমে ঘরের এককোণে ঝুলাইয়া রাখ ও লাঠির ছায়াটি কত লম্বা তাহা ফিতা দিয়া মাপিয়া দেখ। এইবার লণ্ঠনটি লাঠির দিকে আগাইয়া আন এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য পুনরায় মাপ কর। দেখিবে যে লণ্ঠনটি যতই লাঠির দিকে আসিবে

ছায়াটিও তত ছোট হইয়া যাইবে। এইরূপে লণ্ঠনটি লাঠির মাথার উপর আসিলে তখন ছায়াটি সবচেয়ে ছোট হইয়া যাইবে। এবার লণ্ঠনটি লাঠিখানি হইতে উল্টাদিকে ক্রমশঃ দূরে লইলে দেখিবে যে ছায়াও উল্টাদিকে পড়িবে এবং দূরত্ব যত অধিক হইবে, ছায়াও তত লম্বা হইতে থাকিবে।

রৌদ্রে দাঁড়াইলে আমাদের দেহের যে ছায়া পড়ে তাহা ঐ একই কারণে সকালে বড় ও দুপুরে ছোট দেখায়। লণ্ঠনটি দূরে থাকিলে যেমন লাঠির ছায়া লম্বা হয়, তেমনি সকাল বেলা সূর্য্য অনেক দূরে থাকে বলিয়া আমাদের দেহের ছায়া লম্বা হয়। যতই বেলা বাড়িতে থাকে সূর্য্য ততই নিকটে আসে এবং সেজন্য দেহের ছায়াও ছোট হইতে আরম্ভ করে। দুপুর বেলা সূর্য্য প্রায় আমাদের মাথার উপর আসে সেজন্য সে সময় ছায়াও সব ছোট হয়। দুপুরের পর সূর্য্য যেমন আবার দূরে যাইতে আরম্ভ করে, ছায়াও তেমনি লম্বা হইতে থাকে। তবে এ সময় সূর্য্য উল্টা দিকে যায় বলিয়া দেহের ছায়াও উল্টা দিকে পড়ে।

কোথাও আলো জ্বালাইলে সেই আলোর রশ্মি সেখান হইতে চারিদিকে সোজা পথে যায় বলিয়া ঐ আলোর সম্মুখে বই, পেন্‌সিল ইত্যাদি যে কোন অস্বচ্ছ জিনিষ রাখিলে তাহার ছায়া পড়ে। কারণ আলো হইতে যে রশ্মিগুলি ঐ জিনিষের উপর পড়ে, তাহারা জিনিষটিকে ভেদ করিয়া অপরদিকে বাহির হইতে পারে না। কিন্তু যে রশ্মিগুলি

জিনিষটির চারিধারের গা ঘেঁসিয়া যায়—সেগুলি সোজা চলিয়া গিয়া কোন পর্দ্দা বা দেওয়ালের উপর পড়িলে রশ্মিগুলির দ্বারা আলোকিত জায়গার মধ্যের স্থানটি আঁধার থাকে, এবং ঐ আঁধার স্থানটিকেই জিনিষটির ছায়া বলে।
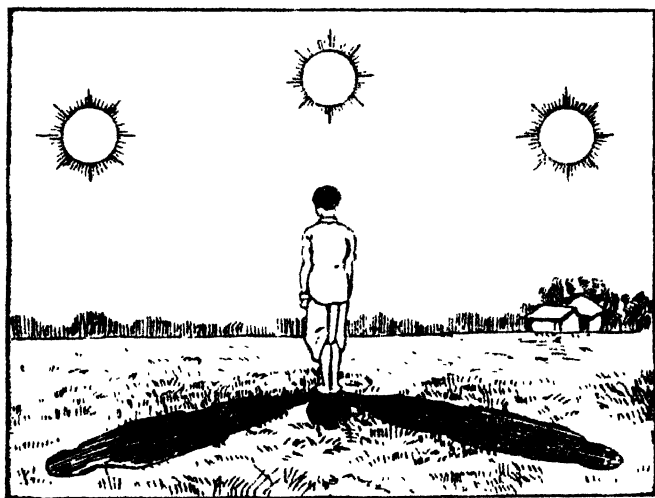
রৌদ্রে দাড়াইলে আমাদেব ছায়া সকালে দুপুরে ও বিকালে যেরূপ ছোট বড় হয় তাহার ছবি

উপরের চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে সকালে বা দুপুরে রৌদ্রে দাঁড়াইলে আমাদের দেহের ছায়া বড় ছোট দেখায় কেন? সূর্য্যের যে রশ্মিগুলি মাথার উপর পড়িতেছে সেগুলি সোজাপথে গিয়া জমির উপর পড়িয়াছে। পা

জমির উপরেই আছে বলিয়া পায়ের ছায়া সেইখানেই পড়িবে। সূর্য্য যতই নিকটে আসিবে উহার রশ্মিগুলি মাথার উপর হইতে ততই দেহের নিকটে আসিয়া জমির উপর পড়িবে, এবং সেজন্য পায়ের ছায়া হইতে মাথার ছায়া পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে।

রাত্রে রাস্তার ল্যাম্প-পোষ্টের আলোর ধার দিয়া যখন হাটিয়া যাও, তখন এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া দেখিও। যখন তুমি ল্যাম্প-পোষ্টের নিকটে থাক তখন তোমার ছায়াটি খুব ছোট থাকে; কিন্তু যত দূরে যাইতে থাক তোমার ছায়াটিও তত লম্বা হইতে আরম্ভ হয়।

আয়নায় কি করিয়া মুখ দেখা যায় ?

কোন জিনিষকে দেখিতে হইলে প্রথমেই আলোর দরকার। আলো না থাকিলে চোখ থাকিয়াও কোন লাভ নাই। চোখ দিয়া আমরা দেখি বটে কিন্তু আলো না থাকিলে কোন জিনিষ আমাদের চোখের যত সাম্‌নেই রাখা যাক্, কিছুতেই তাহাকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। অন্ধকার ঘরের ভিতর কোন জিনিষই দেখা যায় না, কিন্তু একটি

দেশালাইয়ের কাঠি জ্বালিলে বা ইলেক্‌ট্রিক সুইচ্ টিপিলেই অমনি ঘরের চেয়ার, টেবিল, বই, কাগজ সব দেখা যায়, আবার চোখ বুজিলেই সব অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, কিছু দেখিবার জন্য চোখ ও আলো দুইই চাই।

এইবার কি উপায়ে আমরা দেখিতে পাই সেই কথা বলিব। লণ্ঠনের বা অন্য যে কোন আলো জ্বালিলে ঐ আলো তখনই চারিদিকে ঠিক সোজা পথে ছুটিয়া যায়, বাঁকা-চোরা হইয়া যায় না। সূর্য্যের আলোও ঠিক সোজা লাইনে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে। যে অসংখ্য লাইনে আলো ছুটিয়া আসে সেই লাইনগুলিকে আমরা রশ্মি বলি। যখন কোন খোলা জানালার ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো ঘরের ভিতর আসিয়া পড়ে সেই সময় সেই ঘরের সকল দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ঘর আঁধার করিয়া দিলে দেখিবে যে সেই জানালার ফাঁক দিয়া যে আলো ঘরের ভিতর আসিতেছে উহার পথ একেবারে সোজা। জানালায় যদি ফাঁক না থাকে তবে একটি ছোট ছিদ্র করিয়া দিলে উহা দেখিতে পাইবে, এবং ঐ ছিদ্রের নিকট তোমার কাপড় বা রুমাল ঝাড়িয়া দিলে যে ধূলা উড়িবে তাহাতে ঐ রশ্মি-পথ আরও ভাল দেখা যাইবে, কেন তাহা পরে বলিতেছি।

আলোর রশ্মি যে সোজা পথে যায় অনেক সহজ পরীক্ষার দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যায়। যখন ঘরে লণ্ঠন জ্বলিতেছে

তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া এক চোখ বুজিয়া আর এক চোখের সাম্‌নে একটি পেন্‌সিল বা তোমার হাতের একটি আঙ্গুল সোজা করিয়া রাখিলে দেখিবে যে লণ্ঠনের শিখাটিকে আর দেখা যাইবে না। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া এরূপ করিলে দেখিবে যে সূর্য্যও ঢাকা পড়িয়া যাইবে। ইহাতে বুঝা যায় যে আলো সোজা পথে চলে, কারণ লণ্ঠনের শিখা হইতে বা সূর্য্য হইতে আলোর রশ্মি বাঁকা
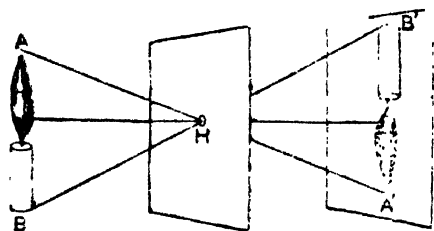
১নং চিত্র।

মোমবাতির ছবি দেওয়ালের গায়ে উল্টা হইয়া পড়িয়াছে।

পথে চোখে আসিয়া পড়িলে উহারা পেন্‌সিল বা আঙ্গুল দিয়া ঢাকা পড়িত না, উহাদের পাশ দিয়া ঘুরিয়া চোখে আসিতে পারিত।

এ বিষয়ে আর একটি মজার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। একখানি শক্ত কাগজে মোটা সূচ দিয়া একটি ছিদ্র (H) কর (১নং চিত্র)। ঘরের কোন দেওয়ালের সম্মুখে একটি মোমবাতি (AB) জ্বালাও এবং ঐ কাগজখানি ১নং চিত্রের ন্যায় বাতি ও দেওয়ালের ভিতর খাড়া করিয়া রাখ, যাহাতে

ছিদ্রটি বাতির শিখার প্রায় সমান উঁচুতে থাকে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দাও যাহাতে বাহির হইতে অন্য আলো না আসে। দেখিবে যে দেওয়ালের উপর বাতির শিখার যে ছবি পড়িয়াছে তাহা ঠিক উল্টা। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে আলোর রশ্মি ছিদ্রের ভিতর দিয়া ঠিক সোজা পথে গিয়াছে। বাতির শিখার যে কোন জায়গা হইতে ছিদ্রের ভিতর দিয়া সোজা লাইন টানিয়া দেখিবে যে শিখার ছবিটি ঠিক উল্টা পড়িবে, অর্থাৎ শিখার উপরের দিক ছবির নীচে ও শিখার নীচের দিক ছবির উপরে আসিবে। আলোর রশ্মি বাঁকিয়া গেলে এরূপ হইত না।

সূর্য্যের, লণ্ঠনের বা মোমবাতির যে কোন আলো হইতে অসংখ্য রশ্মি চারিদিকে সোজা পথে ছুটিয়া চলে। ঐ রশ্মি সোজাসুজি আমাদের চোখে পড়িলে আমরা সূর্য্যকে বা লণ্ঠনের শিখাকে দেখিতে পাই। ঐ আলোর রশ্মির পথে কোন জিনিস থাকিলে তাহার উপর যতগুলি রশ্মি পড়ে তাহার অধিকাংশই উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, কিছু জিনিসটির ভিতরেও প্রবেশ করে। কাচের মত স্বচ্ছ জিনিষের উপর পড়িলে বেশীর ভাগ রশ্মি ভিতরে প্রবেশ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হয়, আর সামান্য কিছু উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া যায়। যে রশ্মিগুলি জিনিষের উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া যায় সেগুলি আর সম্মুখ দিকে যাইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে।

একটি দৃষ্টান্ত লও। একটি রবারের বল দেওয়ালের গায়ে বা ঘরের মেঝের উপর ছুড়িয়া দিলে বলটি ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসে, কিন্তু ঠিক কোন্ দিকে ফিরিয়া আসিবে তাহা নির্ভর করে বলটি কিরূপ ভাবে দেওয়ালের বা মেঝের উপর পড়িয়াছে তাহার উপর; অর্থাৎ বলটিকে
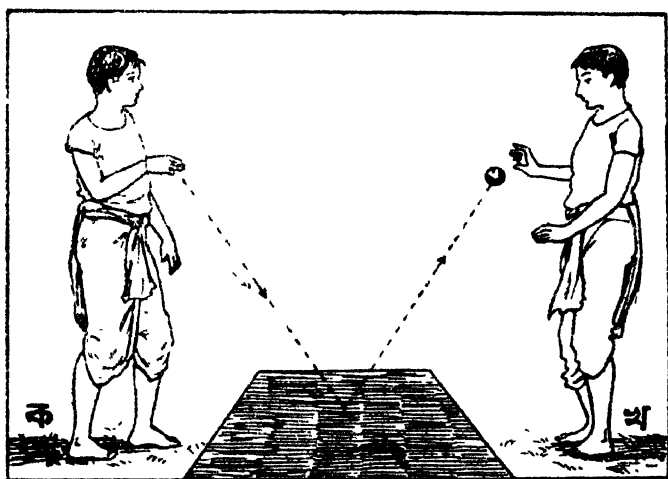
(নং চিত্র)

(ক) বালকটি বল ছুড়িয়াছে, এবং বলটি মেঝের উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া (খ) বালকের হাতের দিকে যাইতেছে।

যদি ঠিক খাড়া করিয়া মেঝের উপর ফেল তবে উহা ঠিক সেই খাড়া পথেই ফিরিয়া আসিবে। যদি বাঁকাইয়া ফেল তবে মেঝের একদিক হইতে যতটা বাঁকিয়া পড়িবে,

অপরদিক হইতে ঠিক ততটা বাঁকিয়া উঠিয়া যাইবে। ২নং চিত্রে দেখ বালকটি একটি বল বাঁকাইয়া ঘরের মেঝের উপর ফেলাতে অপর দিকে বলটি কিরূপ বাঁকিয়া উঠিয়াছে।

আলোর রশ্মি ও ধাক্কা খাইয়া ঠিক রবারের বলটির মত ফিরিয়া আসে। এইরূপ ফিরিয়া আসাকে ভাল কথায় **পরাবর্ত্তন** বলে। যে জিনিষের উপরিভাগ যত আব্ড়ো-খাব্ড়ো বা খস্‌খসে তাহার উপরের কণাগুলি তত উঁচু-নীচু থাকে। সেজন্য এ সব জিনিষের উপর আলো পড়িলে, উহাদের উঁচু-নীচু কণাগুলি হইতে ধাক্কা খাইয়া আলোর রশ্মিগুলি ঠিক্‌রাইয়া এদিক-ওদিক ছড়াইয়া যায় (৩ (b) নং চিত্র দেখ)। যে জিনিষ যত পালিশ তাহার উপরের কণাগুলি তত এক সমান থাকে, উঁচু নীচু থাকে না। সেজন্য এ সব জিনিষের উপর আলো পড়িলে ধাক্কা খাইবার পর উহার রশ্মিগুলি প্রায় সব একই নির্দ্দিষ্ট দিকে যায় (৩ (a) নং চিত্র দেখ)।
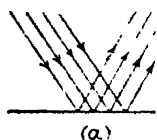
(a)

(b)

৩নং চিত্র
আলোকরশ্মির পরাবর্ত্তন

গাছপালা, চেয়ার-টেবিল, কাপড়-চোপড়, কাগজ-পেন্‌সিল ইত্যাদি সব খস্‌খসে জিনিষের উপর আলো পড়িলে উহা ৩ (b) নং চিত্রের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ; কিন্তু কাচের মত পালিশ জিনিষের উপর পড়িলে ধাক্কা খাইবার পর রশ্মিগুলি ৩ (a) নং চিত্রের মত একই দিকে যায়।

• এই ছড়ানো আলোক-রশ্মিগুলির জন্যই আমরা জিনিষ পত্র দেখিতে পাই। মনে কর একটি আঁধার ঘরের জানালার ছিদ্র দিয়া সূর্য্যের বা কোন লণ্ঠনের আলো আসিয়া ঘরের ভিতর পড়িতেছে। ঐ আলো আসিয়া যদি কোন চেয়ারের উপর পড়ে তবে ঐ চেয়ারের দ্বারা ছড়ানো আলো ঘরের চারিদিকে যাইবে। তুমি ঐ আঁধার ঘরের যেখানেই দাঁড়াও, চেয়ারটির হাতল, পায়া ইত্যাদি চারিদিক হইতে ঐ ছড়ানো আলো তোমার চোখে পড়িবে এবং তখন চেয়ারটিকে দেখিতে পাইবে। কিন্তু ঐ আলোর পথে যদি একখানি ভাল আয়না রাখিয়া দাও তবে দেখিবে যে এবার আলো চারিদিকে না ছড়াইয়া সব একই নির্দ্দিষ্ট দিকে গিয়া দেওয়ালের গায়ে কোথাও এক সঙ্গে জড় হইবে ও সেখানে একটি উজ্জ্বল দাগ দেখা যাইবে। যদি লণ্ঠনের আলো হয় তবে ঐ রশ্মি পথে চোখ রাখিলে লণ্ঠনের আলোর শিখার ছবি দেখা যাইবে, আর সূর্য্যের আলো হইলে সূর্য্যের গোল ছবি দেখা যাইবে, কিন্তু ঘর যদি খুব অন্ধকার হয় এবং আয়নাখানি যদি খুব ভাল হয়—অর্থাৎ এমন পালিশ যে উহার উপর আলো ধাক্কা খাইবার পর আলোর রশ্মিগুলি চারিদিকে না ছড়াইয়া একই নির্দ্দিষ্ট দিকে যায়—তবে ঘরের কোথাও দাঁড়াইয়া আয়নাখানিকে দেখা যাইবে না। কারণ এবার চেয়ার, টেবিল ইত্যাদির ন্যায় আয়নাখানির চারিদিক হইতে ছড়ানো আলো চোখে আসিয়া পড়িবে না। আয়নাখানি

আলোর রশ্মিগুলিকে ঘুরাইয়া এক নির্দ্দিষ্ট দিকে পাঠাইবে, এবং চোখ সেইদিকে থাকিলে আমরা আয়নার পরিবর্ত্তে যে জিনিষ হইতে আলো আয়নার উপর আসিতেছে সেই জিনিষকে দেখিতে পাইব। এবার আয়নাখানির উপর যদি সামান্য ধূলা-বালি ছড়াইয়া দাও তবে আয়নাখানিকে ঘরের সকল জায়গায় দাঁড়াইয়া সহজেই দেখা যাইবে। তখন আর উহার দ্বারা সূর্য্যের বা লণ্ঠনের শিখার ছবি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইহার কারণ ধূলা-বালির জন্য আয়নার উপরটা আর সেরূপ পালিশ থাকিবে না, উঁচু-নীচু হইয়া যাইবে, এবং তখন উহার উপর আলো পড়িলে আলো চারি-দিকে ছড়াইয়া যাইবে। সেজন্য তখন সকল দিক হইতেই আয়নার চারিপাশে দ্বারা ছড়ানো আলোর রশ্মি পাওয়া যাইবে বলিয়া আয়নাটিকে দেখা যাইবে। আয়নাটি তখন আর আলোর রশ্মিগুলি কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে পাঠাইতে পারিবে না বলিয়া ঐ আয়না দিয়া কোন জিনিষের ছবি দেখা যাইবে না। আয়নার উপর ময়লা পড়িলে যে ভাল মুখ দেখা যায় না ইহার কারণ এখন বুঝিতে পারিলে।

মোমবাতির বা লণ্ঠনের আলোর শিখাকে অথবা সূর্য্যকে আমরা দেখিতে পাই, কারণ তাহারা আলোর রশ্মি সোজাসুজি আমাদের চোখে পাঠায়; কিন্তু যদিও গাছপালা, ঘর-বাড়ী, বই-কাগজ ইত্যাদির নিজেদের আলো নাই, তথাপি উহাদের দেখিতে পাই কারণ সূর্য্যের বা অন্য কিছুর আলো উহাদের

উপর পড়িলে তাহার রশ্মিগুলিকে উহারা চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। সুতরাং আমরা যেদিকে দাঁড়াই সে দিকেই ঐ সব জিনিসের প্রত্যেক অংশ হইতে কতকগুলি ছড়ানো রশ্মি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে এবং সেজন্য সকল দিক হইতে উহাদিগকে দেখিতে পাই। পড়িবার সময় বইয়ের পাতা দেখিতে পাইতেছ কারণ কাগজের কণাগুলির দ্বারা ছড়ানো আলোর কতক তোমার চোখে পড়িতেছে। অন্ধকার ঘরের ভিতর জানালার ছিদ্র পথে কাপড়ের ধূলা ঝাড়িবার পর আলোর রশ্মি ভাল দেখিতে পাইয়াছিলে কারণ তখন ঐ ধূলিকণাগুলি আলোর রশ্মি ঠিক্‌রাইয়া তোমার চোখে ফেলিতেছিল। যদি ইহা সম্ভব হয় যে ঘরের ভিতর কিছু ধূলিকণা নাই তবে দেওয়ালের গায়ে উজ্জ্বল আলোর দাগটিকে কেবল দেখিতে পাইবে, কিন্তু ছিদ্র হইতে দেওয়াল পর্য্যন্ত পথের মধ্যে আলো দেখিতেই পাইবে না।

আয়নার ভিতর আমরা যে জিনিষের ছবি দেখি, সেই জিনিষের উপর সূর্য্যের বা অন্য কোন আলো পড়িয়া সেই আলো ঘুরিয়া আয়নার উপর পড়ে, এবং আয়না হইতে ঘুরিয়া পুনরায় আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে যে জিনিষ যত বেশী আলোর রশ্মি আমাদের চোখে পাঠাইতে পারে তাহাকে তত স্পষ্ট দেখা যায়। দিনের বেলা ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বাহিরের গাছপালা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ তাহাদের উপর সূর্য্যের জোর আলো পড়িয়া সেগুলি

ঠিক্‌রাইয়া আমাদের চোখে আসিতেছে। কিন্তু বাহিরে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরের জিনিষ তত ভাল দেখা যায় না; কারণ ঘরের ভিতরে সূর্য্যের আলো সোজা গিয়া পড়ে না। বাহিরের গাছপালা ইত্যাদিতে যে আলো পড়ে, সেই আলো ঐ সমস্ত জিনিষ দ্বারা ছড়াইয়া যায়, এবং তাহারই কতক অংশ ঘরের ভিতর যায়। সেজন্য ঘরের ভিতরের আলোর জোর অনেক কম। এই কম জোরের আলো ঘরের ভিতরের জিনিষ পত্রে পড়িয়া ঠিক্‌রাইয়া আসাতে তাহার জোর আরও কমিয়া যায়। সুতরাং বাহিরের বেশী জোরের আলোর তুলনায় ঐ কম জোরের আলোর দ্বারা আলোকিত জিনিষ পত্র অস্পষ্ট দেখায়।

তোমরা বোধ হয় জান যে কাচ স্বচ্ছ পদার্থ। যাহার ভিতর দিয়া এক দিক হইতে অপর দিকের জিনিষ দেখা যায়—অর্থাৎ যাহার ভিতর দিয়া আলো সহজে চলিয়া আসিতে পারে—তাহাকে স্বচ্ছ জিনিষ বলে। যদিও সাধারণতঃ কাচ দিয়া আয়না তৈরী হয় কিন্তু তাই বলিয়া শুধু কাচ আয়নার কাজ করিতে পারে না। কারণ কাচের উপর আলো পড়িলে উহার অধিকাংশই কাচের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়, সুতরাং যথেষ্ট আলো কাচের উপর হইতে ঘুরিয়া না আসিয়া চোখে না পড়িলে আমরা কি করিয়া দেখিতে পাইব? আয়না প্রস্তুত করিতে হইলে খুব পালিশ কাচের প্লেটের পিছনে একটি প্রলেপ লাগাইতে হয়। সব আয়নার

পিছন দিকে এরূপ প্রলেপ লাগান থাকে তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ পারা খুব পালিশ ও চক্‌চকে জিনিষ, সেজন্য পারার উপর আলো পড়িলে উহা সহজেই ৩ (ব) নং চিত্রের মত কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে পরাবর্ত্তিত হয় বা ঠিক্‌রাইয়া আসে। খুব পাতলা টিনের পাতের উপর পারা লাগাইলে পারা টিনকে গলাইয়া ফেলে। এই দুইটি জিনিস মিশাইয়া যে প্রলেপ তৈরী হয় উহাই আয়নার পিছন দিকে লাগান থাকে। কাচের পিছনে পারার প্রলেপ দেওয়া থাকাতে
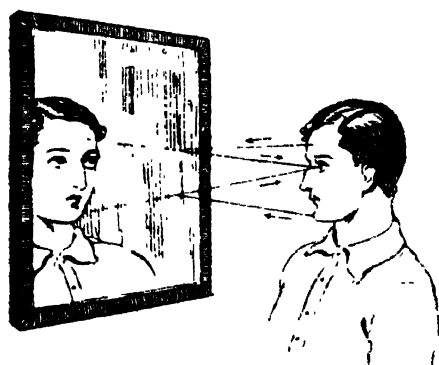
(৪ নং চিত্র)
আয়নায় মুখ দেখা।

কাচের উপর যে আলো পড়ে তাহা কাচের ভিতর দিয়া গিয়া পারার উপর পড়িয়া পুনরায় ফিরিয়া বাহির হইয়া আসে। পারার উপর কাচ থাকাতে আর এক সুবিধা হয় যে পারার পালিশ শীঘ্র নষ্ট হয় না এবং সেজন্য উহার আলোর রশ্মি পরাবর্ত্তিত করিবার ক্ষমতাও শীঘ্র নষ্ট হয় না।

এইবার আয়নায় কিরূপে মুখ দেখা যায় তাহা ৪নং চিত্র দেখিলে ভাল বুঝিতে পারিবে। আলোকিত জায়গায় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইলে আলো প্রথমে আমাদের গায়ের বা মুখের উপর পড়িয়া সেখান হইতে ঠিক্‌রাইয়া বা পরাবর্ত্তিত হইয়া আয়নার উপরে পড়ে। ৪নং চিত্রে দেখ লোকটির মুখের উপর লণ্ঠনের বা সূর্য্যের যে আলো পড়িয়াছে সেই আলোর রশ্মি উহার কপালের এক জায়গা ও চিবুকের এক জায়গা হইতে আসিয়া আয়নায় পড়িয়াছে, এবং আয়নার দ্বারা পরাবর্ত্তিত হইয়া চোখে আসিয়া পড়িয়াছে। মুখের বা গায়ের যে যে স্থান হইতে আলো আসিয়া এইরূপে ঘুরিয়া পুনরায় চোখে আসিয়া পড়িতেছে সেই সেই স্থানগুলি আয়নার মধ্যে দেখা যাইতেছে ও মনে হইতেছে যেন আয়নার পিছনে ছবিটি রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না যে সত্যসত্যই তোমার মুখের ছবিটা আয়নার পিছন দিকে আছে. উহা ভ্রান্তি মাত্র। এই ভুলের জন্য. একটি বিড়ালকে আয়নার সম্মুখে বসাইয়া দিলে, আর একটি বিড়াল বসিয়া আছে ভাবিয়া সে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করে।

আয়নায় ছবি দেখিবার সময় আর একটি বিষয় বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে যদিও ছবিটি প্রথমে ঠিক তোমারই মত মনে হয় কিন্তু দেখিবে যে তোমার ডান হাত ছবির মানুষটির বাঁ দিকে ও বাঁ হাত ডান দিকে গিয়াছে ;